কালের রাখাল

চিত্তরঞ্জন মাইতি

আনন্দধারা প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৭১

প্রকাশক
মনোরঞ্জন মজুমদার
আনন্দধারা প্রকাশন
৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
বীরেশ্বর চক্রবর্তী
স্ট্যাণ্ডার্ড আর্ট প্রিন্টার্স
১১৫এ, আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

'হে হে কেরি কেরি কেরিগা···কেরিগা···কেরিগা'···

ঘাটির দিকে কচি হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে অম্রু ডাক পাড়ছে। পথের ধারে মস্ত এক টোহ্‌লের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে ছাল্লুটা। তার তরতাজা মুখখানার ওপর এসে পড়েছে সরশোন ফুলের মত ভোর-বেলাকার নরম হলুদ আলো। কে শোনে কার কথা। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বক্‌রির সাদা নধর বাচ্চাটা উপভোগ করছে টিলার ওপর আরোহণের কৃতিত্বটুকু।

শতরুণ্ডীর ল্যাসে ভেড় আর বক্‌রির পাল নিয়ে গত সন্ধ্যায় এসে পৌঁছেছে হরিচন্দ্‌। সঙ্গে দশ বছরের ছেলে অম্রু। এই প্রথম অম্রু বাবার সঙ্গে ভেড় বক্‌রি তাড়িয়ে নিয়ে পাঙ্গী চলেছে। সামনেই সাচ জোৎ (পাশ)। বেলা বেড়ে ওঠার আগেই ওদের জোৎ পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে।

ছিলমের ভেতর এক টুকরো চুগল ফেলে নেড়ে নিল হরিচন্দ্‌। কল্কের গায়ে টুকুর টুকুর শব্দ তুলল পাথরের নুড়িটা। ডোরে ঝোলান বগ্‌লির ভেতর থেকে এক ডেলা তামাকু বের করে ঠেসে ভরল ছিলমে। এবার পাথরের টুকরোর ওপর রুন্‌কা ঘষে ভুজ্জ গাছের শুকনো ছালে আগুন ধরাল। বাঁ হাতে হুঁকোখানা টেনে এনে তার ওপর ছিলম বসিয়ে জুৎ করে টানতে লাগল। ভুড়ুক ভুড়ুক ভুড়ুক আওয়াজ উঠছে। শেষরাতে মক্‌কির রুটি পাকিয়ে খাওয়ার কাজ চুকিয়েছে বাপ বেটায়। এখন একটু নেশা করে নিয়েই উঠে পড়বে হরিচন্দ্‌। তামাকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চোখ গিয়ে পড়ল অম্রুর দিকে। দশ বছরের ছেলে কে বলবে! তাড়সে বেড়ে উঠেছে চিকন বাঁশের মত। অবিকল মায়ের মুখখানা বসানো। গঙ্গীর মুখটা মনে পড়তেই হুঁকোর টান থেমে গেল। বুকখানা মুচড়ে দিয়ে একটা

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ।

প্রভুর পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে শুয়েছিল রুক্কা। কালো লোমওলা কুত্তর বা কুকুর। অমরুর ডাক কানে যেতেই ঘাড় কাৎ করে একবার দেখে নিল দৃশ্যটা। ভাবখানা এই, রোসো, টোহলের ওপর চড়ে কারদানি মারা তোমার বের করছি।

উঠল হরিচন্দ্। খাড়াই পাহাড় বেয়ে বরফের ওপর দিয়ে জোতের দিকে এগোতে হবে।

'হ্যালা হুই, হ্যালা হুই'—রব উঠল। ভেড় আর বক্‌রির পাল সারি দিয়ে পথ চলেছে। সামনে চলেছে গা গতরে যারা পটু। মাঝে চলেছে সেইসব ভেড় বক্‌রি, যারা অল্প দিনের ভেতরেই বাচ্চা বিয়োবে। সব শেষে ভেড়ের বাচ্চা উর্ণু উর্ণী আর বক্‌রির বাচ্চা ছাল্লু ছাল্লির দল। গদ্দী কুত্তর ঢুঁ মেরে মেরে ওদের সারি সিধে রাখছে।

ঠিক জায়গায় এসে হরিচন্দের কুত্তর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠল টোহলের ওপর। ঘ্যাঁক করে ধমকাতেই গলা কাঁপিয়ে কান্না জুড়ে দিল ছাল্লুটা। ঢুঁ মারতে মারতে রুক্কা তাকে পথ দেখিয়ে দলে এনে ভেড়াল। এখন দুশো ভেড় আর বক্‌রির একটা দল প্রায় নিঃশব্দে খাড়াই পাহাড়ী পথ ধরে এগিয়ে চলল।

সামনে রুক্কা চলেছে কান খাড়া করে। প্রভুর মুখের রকমারি সিষ্ক্ বা শিস্ শুনে সে বুঝে নিয়েছে ডাইনে বাঁয়ে, কোন দিকে সে চালিয়ে নিয়ে যাবে তার দলটাকে। একটু বেচাল হলেই ভেড় বক্‌রিদের শুনতে হবে কড়া ধাতানি। রুক্কার কাছে পার পাবার জো নেই। মাঝে চলেছে অমরু? উৎসাহটা তারই বেশী। কতদিন বলে বলে তবে সে এ বছর বাবার সঙ্গে আসবার অনুমতি পেয়েছে। জন্ম দিয়েই মা মরেছে। তারপর থেকে এই দশ বছরের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে মামার বাড়ী কাংড়ায়। মামা আর মামীর ছেলেপুলে কেউ নেই, তাই অমরুই তাদের মাথার ঠাকুর। তাছাড়া গদ্দীদের ভেতর

ভাগ্নে যত ছোটই হোক, মামার চোখে সে দেওতা। তাকে সবচেয়ে বেশী খাতির যত্ন করতে হয়।

বসন্ত আর গ্রীষ্ম ঋতু শেষ হলে হরিচন্দ্ কুলু কাংড়ায় শীতের চারণ শেষ করে ভেড় নিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। আসার সময় প্রতিবারই মামার বাড়ী থেকে সঙ্গে নিয়ে আসে ছেলেকে। আবার ঝার্‌রি শুরু হবার আগেই মামা এসে ভাগ্নেকে নিজের কাছে নিয়ে চলে যায়। শূন্য ঘরে তখন একা হরিচন্দের মন হু হু করে। সে অমনি ভেড় বক্‌রি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে পাঙ্গীর উদ্দেশ্যে। পাক্‌কা তিনটি মাস চারণ শেষ করে ওপরের পাহাড়ে হাইউন্দ বা শীতের বরফ পড়ার আগেই দল নিয়ে নেমে আসে নিচে।

সবার শেষে বাচ্চাগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে হরিচন্দ্। এবার পাহাড়ী পথ, বড্‌ড খাড়াই। গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। নেড়া পাহাড়ের এদিক-ওদিক ফাঁক-ফোকরে উঁকি দিচ্ছে হরেক রঙের তারা-ফুল। গিরিপথের মুখ-বরাবর তাও আবার ফুরিয়ে এল। শেষ পথটুকু হামা দিয়ে উঠতে হবে। অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে অম্রু। হরিচন্দ্ ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে আর একবার ছেলেকে মনে করিয়ে দিলে, জোৎ পার হবার সময় কথা বলতে নেই। পাহাড়ের আঁকে বাঁকে পথ চলার সময় হরিচন্দ্ কতবার আউড়েছে কেহ্‌লু বীরের নাম। পাহাড়ের ঢালে বাস করেন কেহ্‌লু বীর। রাগলে রক্ষে নেই। বড় বড় পাথরের চাঁই ওপর থেকে গড়িয়ে ফেলে সারা পথ ভেঙে চুরমার করে দিতে পারেন তিনি। পথচারী পহাল পহালনিদের তাই পথের দেবতাদের তুষ্ট করে রাখতে হয়। এবার আসছেন জোতের দেওতা। গিরিপথের একপাশে ত্রিকোণ পাথরের একটা স্তূপ। ওরই ভেতর দেওতার বাস। নানান রঙের নিশান উড়ছে তাঁর ঘরের মাথায়।

নিঃশব্দে চলেছে দলটি। দেওতার থানে এসে হরিচন্দ্ লাল কাপড়ের একটা টুকরো অম্রুর হাতে ধরিয়ে দিল। ইঙ্গিত করল পাথরের

স্তূপের কাছাকাছি একটা অসুচ্চ বাঁশের মাথায় বেঁধে দিতে। অমৃরু তাই করল। ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে মনে মনে কিছুক্ষণ প্রার্থনা জানাল দেবতার কাছে। রক্ষা কর প্রভু আমাদের ভেড় বক্‌রিদের। আমাদের এই গিরিপথ পার হবার সময় যেন ঝড় না ওঠে। যেন বরফের চাঁই ভেঙে না পড়ে মাথার ওপর।

আগে আগে পথ দেখিয়ে ভেড় বক্‌রির পাল নিয়ে চলেছে রুক্‌কা। পেছনে হরিচন্দ্ আর অম্‌রু।

জোতের শেষ প্রান্তে এখন এসে দাঁড়িয়েছে পুরো দলটা। সামনে পাঙ্গী। দশ বছরের অম্‌রুর গায়ে উলের গরম চোল। কোমরে বক্‌রির লোম দিয়ে তৈরী কালো লম্বা ডোর, পাকে পাকে জড়ানো। হাঁটু অব্দি নেমে এসেছে চোল। তারপর অনাবৃত পায়ের শেষপ্রান্তে চম্বা থেকে কেনা নাগ্‌রা। কোমরে জড়ান ডোর থেকে ঝুলছে পয়সা রাখার বজ্‌লু আর কুল্‌হারা বা কুঠার। বাঁ কাঁধ থেকে ঝুলছে তারের একটা বাদ্যযন্ত্র —রুবানা। মামার কাছে সে শিখেছে রুবানা বাজাতে। এই যন্ত্রটি তার নিত্যসঙ্গী। অম্‌রুর মাথায় কৈলাস পর্বতের চূড়ার আকারে টোপি, বনাল পাখির ঝুঁটি লাগানো। সে চেয়ে আছে নতুন উপত্যকার দিকে। নীল আকাশের বুকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সারি সারি সাদা কাপড়ের বোরখা পরা পাহাড়। স্থির, শান্ত শীতল। নিচে উৎরাই-এর পথ। রোদ্দুরে রূপোর অসির মত ঝলমল করছে চেনাব —নদী চন্দ্রভাগা।

উৎরাই-এর পথে সাবধানে পা ফেলে নামছে ওরা। বরফের চাদর পাতা পথ। সাদা সাদা ভেড়ার পালকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে আসছে হিমবাহ। ওরা এসে থামল ল্যাস তুনেইতে। একটুখানি বরফ-ছাওয়া সমতল। তার আশপাশে অনেক-গুলো চোরা নালা। ওপরে বরফ, নিচে তুরন্ত স্রোতের টান। সব স্রোত গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে চন্দ্রভাগায়। ঠোঁট সরু করে শিস্ দিল হরিচন্দ্। রুক্‌কা ভেড় বক্‌রিগুলোকে একপাক চক্কর দিয়ে ঘুরে এসে

প্রভুর পায়ের কাছে দাঁড়াল।

হরিচন্দ্ ছেলের হাত ধরে বরফের ওপর দিয়ে সাবধানে নালা পেরুতে লাগল। নরম বরফে হঠাৎ পা পড়লেই খপ্ করে ধরে নেবে খরস্রোতা নাগিনী। তারপর বরফঢাকা গোপন সুড়ঙ্গ পথে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে কোন অতলে চন্দ্রভাগায়। হুঁশিয়ার মানুষ হরিচন্দ্। নালার অবস্থান আর বরফের চরিত্র তার নখ-দর্পণে।

এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল হরিচন্দ্। বরফের চাদরে হাঁটু গেড়ে বসে মুখ নিচু করে কান পাতাল। হাঁ, এই সেই নালা, যার ভেতরে সে তার গংগীকে জলদেবতা বীর বাতালের নাম করে বিসর্জন দিয়েছিল।

মুখ তুলে ছেলেকে কাছে ডাকল হরিচন্দ্। অম্রু কাছে এসে তার ডোর থেকে কুল্হারাখানা (কুঠার) খুলে নিয়ে নালার ওপরে বরফ কুপিয়ে তুলতে লাগল। অম্রু বাপকে বরফ সরাবার কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এলে হরিচন্দ্ তাকে বাঁ হাত দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলে। পা পিছলে গেলে আর দেখতে হবে না। অজস্র বরফ এক পাশে ডাঁই করে রেখে একসময় উঠে দাঁড়াল হরিচন্দ্। পাশে রাখা ভেড়ার চামড়ার থলে থেকে মেয়েদের মাথায় বাঁধা রঙীন একখণ্ড ঘুণ্ডি বের করে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল সেটাকে। বছর দশেক আগে সুলতান-পুরে দশেরার মেলায় উল বেচতে গিয়েছিল সে। সঙ্গে ছিল গংগী। সদ্য বিয়ে করা বউ। মনে খুশীর তুফান। দোকানে হরেক রকমের ঘুণ্ডি ঝুলছিল। অবাক হয়ে সেগুলো দেখছিল গংগী। একসময় টুকটুকে লাল একখানা ঘুণ্ডিতে আঙুল ঠেকিয়ে পাশে হরিচন্দের দিকে তাকাল। মুখে চোখে মিষ্টি হাসির ঝিলিক। সঙ্গে সঙ্গে হরিচন্দের বাদশাই মেজাজ এসে গেল। দামী ঘুণ্ডিখানা এক কথায় কিনে ফেলল সে। গংগী হরিচন্দ্কে মেলায় দাঁড় করিয়ে রেখে ছুটল মেলার বাইরে। বিপাশার ধারে একটা ক্র্যা গাছের আড়ালে ঐ সদ্য কেনা লাল ঘুণ্ডিখানা মাথায় বেঁধে মিঠি মিঠি হাসি ছড়াতে ছড়াতে

ফিরে এল মেলায়। হরিচন্দ্ যেন বউকে প্রথম দেখছে। ফাগুন মাসে চিঁউ গাছে ফোটা লাল ফুলের মত বাহার। সারা দিন, সারা রাত ওরা হাত ধরাধরি করে মেলায় পাক খেয়ে বেড়িয়েছিল। সবার সঙ্গে নেচেছিল কুলুর মেলার আসরে। পরের দিন বেরিয়ে দুটি চিত্রিত মুনাল পাখির মত ওরা ভুবু জোৎ পেরিয়ে যেন উড়ে এসেছিল কাংড়ায়। তারপর দু'চার দিন গংগীর এক সখির বাড়ী কাটিয়ে আবার গজপাশ পেরিয়ে ফিরেছিল চম্বায়। সে বছর ওরা শীতটা কাটিয়েছিল সরল উপত্যকায়। বুদ্লির উলাংসা গ্রাঁ ছেড়েছিল বিয়ের পরেই। ঝিঁদ্ ফুঁক্ করে বিয়ে। মহাজন গদ্দীর মেয়ের সঙ্গে ভাব করে ঘর ছেড়েছিল দুজনে। পালিয়ে এসে ইরাবতীর চরে বাগ্গার ঘাসের ঝোপে আগুন জ্বালিয়ে কয়েক পাক ঘুরে বিয়েটাকে সিদ্ধ করে নিয়েছিল। গংগী তার রূপোর কোমরবন্ধনী গোজ্রো থেকে একটুকুরো লাল ফিতে বের করে হরিচন্দের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল, নাও, বেঁধে দাও আমার মাথায়। এই ফিতেটা বেঁধে না দিলে তোমার বউ হব কেমন করে গো?

বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল হরিচন্দের। এই দুনেইতে মরবার সময় গংগীর বিনুনীতে বাঁধা ছিল সেই বিয়ের দেওয়া লাল ফিতে আর মাথায় জড়ান ছিল দশেরার মেলা থেকে কিনে আনা সেই লাল ঘুন্ডি।

হরিচন্দ্ বাঁ হাতে চোখ মুছে স্মৃতির দরজা বন্ধ করে দিল। হাতে ধরা ঘুন্ডির এক কোণায় গত রাতের তৈরী মক্কির রুটি বক্রির দুধে ভিজিয়ে বেঁধে দিয়ে অম্রুকে বললে, এই নে, ধর। এখানে তোর জন্ম হয়েছিল দশ বরষ আগে আর তোকে জন্ম দিয়েই চোখ বুজেছিল তোর মা। আমি তার শরীরটা এই নালা খুঁড়ে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। আজ তোরই হাত দিয়ে তোর মায়ের শেষ চিহ্নটুকু ভাসিয়ে দিতে চাই। বেটার হাতের প্রথম খানা খাবে তার মা। এবার থেকে তুই ফি বরষ এখানে এসে মায়ের সেবা করে যাবি। ভুলবি না বেটা।

দশ বছরের অম্রু কিছু বুঝল, কিছু বুঝল না। সে বাবার হাত

ধরে সাবধানে নালার গহ্বরে মায়ের ভুজ্যিটা ভাসিয়ে দিল।

চরাচর নিস্তব্ধ। অমৃরু শুনতে পেল, ঐ গহ্বরের ভেতর থেকে কে যেন কল্‌কল্‌ শব্দে কথা বলে উঠল। অমৃরু ঠিক ঠিক বুঝতে পারল না সে ভাষা কিন্তু তার শিশু মন স্পষ্ট বুঝল, এ তার মায়ের ভাষা। মা তার হাত থেকে খাবার পেয়ে খুশী হয়েছে।

আবার মুখে আঙুল পুরে সিন্ধ্‌ তুলল হরিচন্দ্‌। রুক্‌কা এগিয়ে নিয়ে চলল তার বাহিনী। পেছন থেকে 'হ্যালা হুই, হ্যালা হুই, কেরি কেরি কেরিগা'—আওয়াজ তুলে বাচ্চা-কাচ্চা সমেত পুরো দলটাকে ঠেলে নিয়ে চলল বাপবেটায়।

পর পর তেজী নালা পার হয়ে চলল ওরা। সব নালাই বরফের চাদরের আড়ালে বয়ে চলেছে। কোনটার ওপরে কঠিন বরফ, কোনটা বা নরম তুলোর মত বরফে ঢাকা। নরম বরফে পা পড়লে আর দেখতে হবে না। সবাই সজাগ, সবাই সাবধান, তবু পড়ে। প্রতি যাত্রায় দু' চারটে করে ভেড় বক্‌রি খোয়া যায়। খাদে পড়ে মরে, চোরা নালার টানে ভেসে যায়। আবার যখন বিশাল বরফের চাঁই বা হেন্‌ ভেঙে পড়ে তখন সমস্ত দলটা অথবা দলের কিছু অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বরফের তলায়।

কিলাড় এগিয়ে আসছে। পাঙ্গী তহশীলের প্রধান আড্‌ডা। পাহাড়ের গায়ে দেখা যাচ্ছে দু' চার ঘর বসতি। একটা তেজী নালা লাট খেতে খেতে ছুটে চলেছে। বরফের চাদর গা থেকে খুলে ফেলে দিয়ে দৌড়ের কসরৎ দেখাচ্ছে নালাটা। পারাপারের জন্য আশপাশের গাঁ এর লোকেরা গাছ ফেলে টাংড়ি (সাঁকো) তৈরী করেছে তার ওপর।

পুরো দলটা সাবধানে পার হতে লাগল গাছের তৈরী সাঁকো। একেবারে নাবালক দু' তিনটে বক্‌রি আর ভেড়ের বাচ্চা গলা কাঁপিয়ে কান্না জুড়ে দিল। হরিচন্দ্‌ দুটোকে চোলের লম্বা দু' পকেটে ঢোকালে। বাকী একটাকে বুকে চেপে দলের পেছন পেছন পেরিয়ে

এল টাংড়ি। পারাপারের সময় পেছন ফিরে ভেড়ার পালকে দেখে নিচ্ছিল অমরু। নালা পেরিয়ে এসে থামল হরিচন্দ্। ছেলেকে বলল, পাহাড়ী পথে পিছু তাকাতে নেই বেটা। জোৎ, নালা পার হয়ে যাবি, পিছু তাকাবি না। যে পড়বে তাকে পড়তে দিবি। আফশোস করবি না। বাকী দল নিয়ে ফুর্তিসে চলবি। এ হল পহালদের কানুন।

কিলাড় এসে গেল। সামনেই বনবিভাগের বাংলো। জংলাৎ ম্যাকমা। বেরিয়ে এল বন-রক্ষক। হরিচন্দ্ সিন্ধ্ ফুঁকল। রুক্কা টুঁ মেরে মেরে সিধে করল পুরো দলটা। এখন আবার সেই মন্ত্রপড়া পাথর। নড়া নেই চড়া নেই, স্থির নিস্পন্দ।

শুরু হয়ে গেল গুণতি। দু' তিনশো ভেড় গুণতে আর সময় লাগে কত? কোন কোন দলে থাকে আটশো, হাজারেরও ওপর ভেড়। তখন পহালরা বনের কর আদায়কারীকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে। তারা ভান করে যেন ভেড় বক্‌রি সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। গুঁতোগুঁতি করে তাদের এলোপাথাড়ি দৌড় করায়। গুণতিতে ভুল হয়ে যায়। হাজার ভেড় আট ন'শো বলে সাব্যস্ত হয়। তির্‌নির টাকা কমে কিছু পরিমাণে। ভেড় পিছু পাঁচ পয়সা আর বক্‌রি পিছু দশ পয়সা তির্‌নি। ভেড়াগুলো একটার পিছে আর একটা ঠিক যেন নদীর স্রোতের মত ঢেউ তুলে তুলে চলে। কিন্তু বক্‌রিগুলো চলতে চলতে এদিক-ওদিক ছিটকে বেড়ায়। বনের কচি চারাগাছ মুখ দিয়ে মুড়িয়ে দেয়। গৃহস্থের তরিতরকারী মুহূর্তে সাবাড়। তাই করের বোঝা ওদের ওপরই বনবিভাগ চাপায় বেশী।

হরিচন্দের এত বেশী ভেড় বক্‌রি নেই, আর সে ফাঁকিও দিতে চায় না। সে যে উপত্যকায় বাস করে তার নাম সরল। সংসারে সে চলে সোজা পথে।

হরিচন্দ্ বজলু থেকে তিরনি বের করে আদায়কারীর হাতে দিল। বন-রক্ষক মানুষটাকে চেনে। বছর দশেক আগে থেকেই সে এই

কিলাড়ের পথে হরিচন্দকে যাওয়া আসা করতে দেখছে। ফাঁকি নেই তার চালচলনে। গুণতির সময় লোকটা সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখে মুখে কোন উদ্বেগ বা ভয়ের ছাপ নেই। আর যারা ফাঁকিবাজ তাদের চোখমুখ দেখলেই চেনা যায়। পিট্ পিট্ করছে চোখ, চমকে তাকাচ্ছে এদিক সেদিক।

বনবাবু হেসে বলল, এবার সঙ্গে ওটি কে ? বেটা নাকি ?

জী হাঁ।

বিলকুল তোমার মত লম্বা।

মুখখানা ঈষৎ কাৎ করে বিনীত হাসি হাসল হরিচন্দ্।

আজ তো কিলাড়েই থাকছ ?

হাঁ জী, আজ, কাল দুটো দিন থাকব।

ফেরার পথে দেখা করে যেও, বলে বনবাবু চলে গেল তার ডেরায়।

হরিচন্দ্ দল নিয়ে এগিয়ে চলল। এখন বসত্ এলাকা শুরু হয়ে গেছে। ছোট ছোট ক্ষেতি। এখনও চাষের কাজ শুরু হয়নি। আর কিছুকাল পরেই শুরু হবে ক্ষেত চষা। কয়েকটা দল ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে। ভেড় বক্‌রির দল চরছে পাহাড়ের গায়ে। পাঙ্গীওলারা এসময় বড় ব্যস্ত। তারা গদ্দীদের আমন্ত্রণ করে আনছে নিজের নিজের ক্ষেতে। পয়সা কড়ি দিয়ে রফা করছে। আবার কেউ কেউ পহালদের খেতে দেবার কড়ারে নিজেদের ক্ষেতের মধ্যে ভেড় চরিয়ে নিচ্ছে। এতে লাভের শেষ নেই। মক্‌কি চাষের সময় এসে গেল। ক্ষেত চষার আগে এমন সার পাওয়া যাবে না। ভেড় বক্‌রির নাদি এ সময়ে কিষাণদের ক্ষেত ভরে দেবে। তাই পাঙ্গীওলাদের কাছে গদ্দী পহালদের খাতিরের শেষ নেই।

হরিচন্দ্ দু' চারখানা ক্ষেত পেরিয়ে কয়েক ধাপ নিচে নেমে এল। ছেনছেল্লার উঠোনের সামনে এসে দাঁড়াল সে। পাথরের চাঁই সাজিয়ে তৈরী দেয়াল। মাথায় কালো চ্যাপ্টা পাথরের চাল। ছেনছেল্লার

কোঠির বাহার ছিল এককালে। এখন অনেকটা শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। আশপাশের ঝোপঝাড়গুলো অযত্নে এদিক সেদিক বেড়ে উঠেছে। একমাত্র ছেলে নিয়ে বিধবা ছেনছেল্লা। আজ পাঁচ বছর ছেলে পাঙ্গীর বাইরে! কাংড়া জেলায় জ্বালামুখীতে দেবীর মন্দির। সেখানে নাকি দিন নেই রাত নেই পাথর ফুঁড়ে আগুনের শিখা উঠছে। ছেনছেল্লার ছেলে ভগৎ। ভারী কৌতূহল তার। সে একাই গেছে দেবীর মন্দিরের সেই শিখা দেখতে। আজও ফেরেনি। ছেলের ফেরার পথের দিকে চেয়ে বুড়ির চোখের জল শুকিয়ে গেল। ওপার থেকে আসা কত মানুষকে জিজ্ঞেস করল কিন্তু কেউ দিতে পারল না হদিস। বুড়ির ছেলে ভগতরামের সঙ্গে সেই প্রথম আলাপ হয়েছিল হরিচন্দের, যেবার গংগী এসেছিল উড়ান্ধারে। হরিচন্দের থেকে দু' চার বছরের ছোট হলে কি হবে, ভগৎ তার দোস্ত বনে গিয়েছিল। যে হরিচন্দ্‌কে খাতির করে ডেকে এনেছিল তার কোঠিতে। ছেনছেল্লা গংগীকে পেয়ে আর ছাড়তেই চায় না। একদিনের জায়গায় পুরো চার চারটে দিন থেকে গেল সে কি আদর যত্ন, সে কি খাতির! চলে যাবার দিন বুড়ি তার ভাবী পুত্রবধূর জন্যে রেখে দেওয়া কাপুর মালাখানা গংগীর গলায় পরিয়ে দিয়েছিল।

ছেনছেল্লা এখন চোখে কম দেখে। হরিচন্দের ডাকে ঘরের বাইরে এসে বাঁ হাতখানা ভুরুর ওপর রেখে আকুল হয়ে বলল, এলি বেটা?

হরিচন্দ্‌ বলল, এবার আমার সঙ্গে নতুন লোক এসেছে। দেখ, চিনতে পার কিনা?

ছেনছেল্লা আরও কাছে সরে এল। মুখ নিচু করে দেখে বলল, হরিচন্দ্‌ অ্যাদ্দিন পরে বেটাকে সঙ্গে নিয়ে এলি বাপ?

গংগীর কথা মনে করে চোখের জল ঝরাল। অমরুকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে আদর করল বুড়ি। তারপর সম্ভবত ছেলের কথা মনে করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ঘরের ভেতর ওদের টেনে নিয়ে গেল বুড়ি।

বয়েস এমন কিছু বেশী নয়, ছেনছেল্লার তবু ভাবনা চিন্তায় বয়েসের ছাপ পড়েছে মুখে। ছেলের জন্যে কেঁদেকেটে অসুখ বাঁধিয়েছে চোখের।

দুটো গাইগরু আছে ঘোরালে (গোয়াল)। বাসার নিচেই ঘোরাল। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওরা ওপরে উঠল। ওপরতলায় দুটো ঘর। একখানা একটু বড়, অন্যটি অপেক্ষাকৃত ছোট। বড় ঘরখানার এককোণে রান্নার ব্যবস্থা। বাকী সবটুকু অংশ জুড়ে শোয়াবসার জায়গা। কাঠের মেঝেতে মোটা করে বিছানা পাতা। হরিচন্দ্ আর অম্রুকে ছেনছেল্লা বিছানার ওপর বসতে বলল। হরিচন্দ্ পিঠে বাঁধা রসদ মেঝেতে নামিয়ে রাখল। ভেড়ার চামড়ার তৈরী থলেতে আটা নুন আর লঙ্কা বয়ে এনেছে সে। জনমানবহীন উড়াঙ্কারে কাটাতে হবে তাদের অনেকগুলো দিন। তাই রসদ বেঁধে নিয়ে চলেছে সঙ্গে। রুটি বানিয়ে ভেড় বক্‌রির দুধে ভিজিয়ে খাবে। চাখ্‌না দেবে নুন আর লঙ্কা। বেশখানিক দূরে বাউড়ি (ঝর্ণা)। সব সময় ভেড়া চরান ছেড়ে এতদূর যাওয়া সম্ভব হয় না। তাই দরকার হলে দুধ খেয়েই ওরা জল তেষ্টা মেটাতে পারে।

ছেনছেল্লা ওদের বসিয়ে রেখে পাশের ঘরে ঢুকল। এটা সারা বছরের ফসল সঞ্চয়ের ঘর, আবার ভাঁড়ার ঘরও বটে। বুড়ি মক্‌কির আটা বের করে আনল। তাড়াতাড়ি খানকতক রুটি বানিয়ে দিতে হবে। খানিকটা সবজিও তৈরী করে দেবে সে।

বুড়ি উনুন ধরিয়ে খাবার তৈরী করতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে গল্প চলল অতিথিদের সঙ্গে। ছেনছেল্লা মানুষটি বড় ভাল আর বিবেচক। সে এই মুহূর্তে ক্লান্ত অতিথিদের কাছে ছেলের কথা তুলে কান্নাকাটি করল না। এখন খিধে তেষ্টায় মানুষগুলো কাতর। আগে কিছু পড়ুক পেটে। তারপর সময় হলে সুখ দুঃখের কথা তোলা যাবে।

চিড় চিড় করে উনুনে কাঠ পোড়ার শব্দ হচ্ছে। বুড়ি সব্‌জি চাপিয়ে আটা মাখতে মাখতে কথা বলে চলেছে।

গত বছর এক রোজ আগে এসেছিলি বেটা।

তোমার এত হিসেবও মনে আছে।

থাকবে না? সেবার তউন্দি গিয়ে বরসাত শুরু হয়েছে, তুই এলি। বললি, জোতের ওপারে ঝার্‌রি চলছে। আমি হিসেব করে বললাম, আজ শাওনের শুরু, ওপারে ঝার্‌রি তো চলবে। আর আজ? শাওনের দু' রোজ হয়ে গেল।

ছেনছেল্লা একটা শ্বাস ফেলে বলল, সব হিসেব আছে রে বেটা। তোর বুড়ি মা সাঁঝ সকাল বসে বসে খালি হিসেব কষছে।

হরিচন্দ্‌ ছেনছেল্লার শেষ কথাটার অর্থ বুঝল। কিন্তু এই সন্তানহারা মাকে কি প্রবোধ দেবে সে। আজও হয়ত বুড়ি ভগতরামের ফিরে আসার দিন গুণছে। কিন্তু হরিচন্দের দৃঢ় বিশ্বাস, সে আর কোনদিন ফিরে আসবে না। প্রথম প্রথম দু' এক বছর হরিচন্দের কাছে কেঁদে পড়েছিল বুড়ি, একবার হরিচন্দ্‌ তাকে জ্বালামুখে নিয়ে যাক, সে ছেলের খোঁজ করে আসবে। কিন্তু হরিচন্দ্‌ তাকে বুঝিয়ে বলেছিল দুর্গম পথের কষ্টের কথা। তা ছাড়া আশ্বাস দিয়েছিল, হাইউন্দে সে যখন ভেড়া নিয়ে কাংড়া যাবে তখন ভগতরামের খোঁজ নেবে সম্ভাব্য সব জায়গায়। খোঁজ করেছিলও সে। মন্দির, দোকান-পাট, আড্ডা, ডেরায়। চেহারার বর্ণনা দিয়ে বোঝাবারও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সব বৃথা। হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর ভেতর কে কাকে চিনে রাখে। ফিরে এসে বুড়িকে সব বুঝিয়ে বলেছিল হরিচন্দ্‌। সব বুঝেও বোঝেনি ছেনছেল্লা। কোন মা প্রাণ ধরে মেনে নেবে, ছেলে আর কোনদিনও ফিরবে না।

হরিচন্দের ছেলেটাকে ছাড়তেই চায়না বুড়ি। সারাটা দিন সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। হরিচন্দ্‌ একা একা ছেনছেল্লার ক্ষেতে ভেড়া চরায়। সে ছেলেকে একবারও কাছে ডাকে না। আহা, অমৃরুকে নিয়ে দুটো দিন যদি বুড়ি শান্তি পায় পাক।

সেই চার দিনের আগে কিলাড় থেকে হরিচন্দ্‌ আর অমৃরুকে

ছাড়ল না বুড়ি। খাওয়াদাওয়া আদর আপ্যায়নে অস্থির করে তুলল বাপ-বেটাকে।

বুড়িকে বড় ভাল লেগে গিয়েছিল অম্রুর। বাপের কাছে না শুয়ে এ ক'টা দিন সে ভাঁড়ার ঘরে ছেনছেল্লার কাছেই শুত। বুড়ি, গল্প করত লক্কর বাঘা আর ভল্লুকের। পাঙ্গী উপত্যকায় প্রচলিত সব গল্প। রাতগুলো জমে যেত গল্পে গল্পে। যাদু ছিল বুড়ির গলায়।

কিলাড় ছেড়ে যাবার দিন শেষ রাতে ছেনছেল্লার বুকের ভেতর মুখ রেখে অম্রু বলল, আমি বড় হলে তোমার ছেলেকে ঠিক খুঁজে এনে দেব তোমার কাছে। তুমি ছেলের জন্যে একবারও কাঁদবে না, বুড়ি মা।

এবার বুড়ি অম্রুকে জড়িয়ে ধরে তার শেষ কান্নাটুকু ঝরাল। গভীর আশা আর আনন্দের কান্না। একটি শিশু-হৃদয়ের বিশ্বাস, ভরসা ছেনছেল্লাকে নতুন করে বেঁচে থাকবার প্রেরণা দিয়ে গেল।

সবে তড়্কা বা উষার আলো ফুটে উঠেছে। আবার সেই পরিচিত রব উঠল কিলাড়ে ছেনছেল্লার ক্ষেতি থেকে। 'হ্যালা হুই। হ্যালা হুই, কেরি কেরি কেরিগা।' উড়াম্ধারের পথে বাহিনী তৈরী। রুক্কা সামনে থেকে পেছনে দৌড়ে দৌড়ে তার অভিযাত্রী দলটিকে সিধে করে নিচ্ছে। এবার পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলল ভেড় বক্রির পুরো দলটা। সামনে পরিচালকের ভূমিকায় রুক্কা। গলায় নতুন একটা বর্ম উঠেছে তার। মোটা ধাতুর পাতের ওপর কাঁটা তোলা পাট্টা। কিলাড় থেকে চোদ্দ মাইল পথ উড়াম্ধার। এ পথের বাঁকে বাঁকে পাহাড়া গুহাগহ্বর আর টিলার আড়ালে লক্কর বাঘার রাজত্ব। এ পথে একমাত্র ভরসা গদ্দী কুত্তর। বাঘের মুখ থেকে ভেড় বক্রি রক্ষার পুরোপুরি দায়িত্ব তার।

এই প্রথম একটা লড়াই দেখল অম্রু। শেষবেলায় ওরা এসে পৌঁছেছিল উড়াম্ধারে। সূর্যের শেষ সোনা তখন মুকুট হয়ে শোভা পাচ্ছিল উত্তর হিমগিরির শিখরে শিখরে। উড়াম্ধারের মখমল সবুজ

নিরু ঘাসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ক্ষুধার্ত ভেড় বক্‌রির দল। পাহাড়ের কোলে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সবুজের বন্যা। চারণভূমি বা কাণ্ডার চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তুষার পর্বতগুলি। জঙ্গল বিভাগ থেকে ভাগ করে দেওয়া আছে প্রত্যেক গদ্দীর জন্যে এক একটি চারণক্ষেত্র। সে তার সীমারেখার ভেতরেই ভেড় বক্‌রি চরাবে, অন্য কারো সীমায় ঢুকতে পাবে না তার বাহিনী। হরিচন্দ্‌ তার নিজের সওয়ানার (নির্দিষ্ট সীমারেখা) ভেতর পৌঁছে গেল অপরাহ্ন বেলায়। উড়াঙ্কারের শেষ প্রান্তটি জংলাৎ ম্যাকুমার লোকেরা হরিচন্দের বাবার আমল থেকেই চিহ্নিত করে দিয়েছে। যদিও অনেকখানি পথ পেরিয়ে পৌঁছতে হয় তার চিহ্নিত কাণ্ডায় তবু একবার দলবল নিয়ে এসে পড়তে পারলে নিশ্চিন্ত। তিনদিকে পাহাড়ের ঢাল খাদে গিয়ে পড়েছে, একদিকে কেবল প্রতিবেশী পহালের সঙ্গে সীমানার বখরা। তাই অন্য পহালদের মত মাঝে মাঝে তুলকালামে জড়িয়ে পড়তে হয় না তাকে।

সবদিক থেকেই তার চারণক্ষেত্রটি লোভনীয় শুধু একটি বিপত্তি ছাড়া। উড়াঙ্কারের যে প্রান্তটি জাস্‌কার পর্বতমালার দিকে সূচল আকার নিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে খাদের দিকে কতকগুলো গুহাগহ্বর আছে। আর ঐ কুদ্‌ বা গুহাগুলোর ভেতরেই থাকে লক্কর বাঘা। হরিচন্দ্‌কে কেবল এই দিকটাতেই সজাগ থাকতে হয়।

কলেল (সন্ধ্যা) ঘনিয়ে ওঠার আগেই ওরা খানকতক রুটি বানিয়ে খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিল। ভরপেট খেয়ে ভেড় বক্‌রিগুলো শুয়ে পড়েছে ঘাসের গদীতে। এক এক জায়গায় বিশ পঁচিশটা করে একসঙ্গে জটলা পাকিয়ে শুয়ে আছে। রুক্‌কা শেষ চক্কর মেরে দেখে নিল সব ঠিক আছে কিনা। তারপর দলের থেকে একটু তফাতে ঘাসের জমিতে থেব্‌ড়ে শুয়ে রইল।

হরিচন্দ্‌ আর অমরু তিরিশ চল্লিশটা ভেড়ার একটা দলের ভেতর শুয়ে পড়েছে। ওদের লোমের কিছুটা উত্তাপ ওরা পেতে পারবে। চারদিক উন্মুক্ত। প্রকৃতির খেয়ালে কখনো বা ক্ষ্যাপা হাওয়া উড়াঙ্কারকে

উড়িয়ে নিয়ে যায়। শীতের করাত হাড়মাস কেটে টুকরো টুকরো করে দেয়। কিন্তু অসীম সহ্যশক্তি এই গদ্দী পহালদের। একখানা গাড়্রু (কম্বল) নিচে পেতে আর একখানায় সর্বাঙ্গ ঢেকে ওরা পড়ে থাকে এই অন্ধকারের সমুদ্রে। শীতের হাওয়া ঢেউ তোলে। তুষার পর্বত দিনরাত্রি ওদের জানায় শীতল অভ্যর্থনা। রাতের নীলাকাশ অগণিত নক্ষত্রের চোখ মেলে মায়ের মমতায় ওদের দিকে চেয়ে থাকে।

কত রাত ঠাওর নেই। রুকুকার একটা ডাক শুনে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল হরিচন্দ্। পাশে পড়ে থাকা রামদা বা দ্রাট্খানা তুলে নিল হাতে। সাপের রাজা কেইলাংরূপে এই তীক্ষ্ণ দাখানা সঙ্গে বয়ে নিয়ে যায় পহালরা। প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় হাতিয়ার হিসেবে।

ব্যাপারটা মুহূর্তে আঁচ করে নিয়েছে হরিচন্দ্। লক্কর বাঘা রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভেড়ের ওপর। টেনে নিয়ে যাচ্ছিল একটাকে ক্ষিপ্র পায়ে, পথ রুখে দাঁড়িয়েছে রুকুকা।

ঘুম ভেঙে গেছে অমরুর। সে অন্ধকারে ঘুম-চোখে দিশাহারা। হাত বাড়িয়ে দেখল বাবা পাশে নেই, সে অমনি উঠে বসল। অন্ধকার চিরে একটা শব্দ তীরের মত ছুটে গেল।

অমরুর বুঝতে বাকী রইল না, এ তার বাবার গলার তীক্ষ্ণ আওয়াজ। একটা কিছু বিপদ সামনের অন্ধকারকে আলোড়িত করছে, এবং সে বিপদের সঙ্গে তার বাবাও জড়িত, এটুকু বোঝামাত্রই সে তার কর্তব্য স্থির করে ফেলল। কুল্হারাটা (কুঠার) কোমরের ডোর থেকে খুলে নিয়ে সেও ছুটল অন্ধকারে শব্দ লক্ষ্য করে।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌঁছে গেছে অমরু। দুটি পশু ও একটি মানুষের সবিক্রম সম্মিলিত আওয়াজে তখন রণক্ষেত্র ঘন ঘন কম্পিত হচ্ছে। কিন্তু বিপদ দেখা দিয়েছে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথির জন্য। চানানির দেখা নেই তাই অন্ধকারে আততায়ীকে চিহ্নিত করে আঘাত হানার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। কুঠার আর কাস্তে উঁচিয়েও কেবলমাত্র হুঙ্কার. আস্ফালন ছাড়া কিছুই করার নেই। এলোপাথাড়ি অস্ত্র

চালালে লক্কর বাঘার সঙ্গে যুদ্ধরত রুক্কা আহত হতে পারে। তাই গলার স্বর চড়িয়ে রণহুঙ্কার চালিয়ে যাচ্ছিল বাপবেটায়। রুক্কা কখনো শব্দ তুলে ছুটে যাচ্ছিল আততায়ীর পেছনে, আবার কখনো লক্কর বাঘা তার শিকারকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে তেড়ে আসছিল রুক্কার দিকে।

হঠাৎ তুষার পাহাড়ের আড়াল থেকে সপ্তমী তিথির ভাঙা চাঁদটা বেরিয়ে এল। তরল হয়ে গলে যেতে লাগল উড়াদ্ধারের গাঢ় অন্ধকার।

হরিচন্দ্ দেখতে পেল লক্কর বাঘা আর রুক্কা একটা মাদী ভেড়ের দু'দিকের দুটো পা ধরে টানাটানি করছে। মুহূর্তে লক্কর বাঘা শিকার ছেড়ে দিয়ে একটা থাবা বসালে রুক্কার গায়ে। কিন্তু রুক্কার গায়ের ঘন গভীর লোমে সে আঘাত অকেজো হয়ে গেল। আবার একটা থাবা এসে পড়ল তার ঘাড়ে। ধাতুর সূচল পাট্টায় প্রতিহত হল সে আঘাত। রুক্কা এবার বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে গিয়ে কামড়ে ধরল বাঘটার পেছনের পা। দুজনেই ঘাসের জমিনে পাক খাচ্ছে। বাঘটা পেছন ফিরছে, গড়াচ্ছে, বেঁকেচুরে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরার চেষ্টা করছে, কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে থেকে রুক্কা বাঘের পাখানা কামড়ে ধরে আছে। তাকে স্পর্শ করে কার সাধ্য।

হরিচন্দ্ দ্রাট্খানা তুলে ধরে ছুটে চলল। অমরুও বাপের পেছন পেছন ছুটছে কুলহারাখানা উঁচিয়ে ধরে। মুহূর্তে লক্কর বাঘা দেখে নিল তার চারদিকে শত্রু সমাবেশ। সে ভুলে গেল তার শিকারের কথা। প্রাণ রক্ষার তাগিদে দেহের সবটুকু শক্তি উজাড় করে দিয়ে সে এক ঝটকায় নিজেকে রুক্কার বাঁধন থেকে মুক্ত করে নিল। তারপর একটা ধূর্ত শৃগালের মত আঁকাবাঁকা ক্ষিপ্রতায় কাণ্ডার প্রান্তে তার আত্মগোপনের জায়গা লক্ষ্য করে ছুটল। কিছু পথ তাকে তাড়া করে নিয়ে গেল রুক্কা। পেছন থেকে প্রভুর সিঙ্ক্ শোনা গেল, অমনি থেমে গেল রুক্কার গতি। লক্কর বাঘা তার

চোখের সামনে পাহাড়ের গহ্বরে লাফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দ্বিতীয়বার হরিচন্দের সিস্ক্ শুনে ফিরে এল সে।

ততক্ষণে বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে শুরু হয়ে গেছে জ্যোৎস্নার প্লাবন। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চরাচর। মাদী ভেড়টা শুয়ে পড়ে আছে জমিনে। প্রাণের কোন চিহ্ন নেই।

রুক্কা মৃত পশুটার পাশে ছুটে গিয়ে একটা আওয়াজ তুলল। হরিচন্দ্ আর অম্রু দৌড়ে এল সেখানে। ঘাসের বিছানায় রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে সদ্যপ্রসূত একটা বাচ্চা, উর্ণ্।

হরিচন্দ্ হাঁটু গেড়ে বসে পরীক্ষা করে দেখল. উর্ণ্টা তখনও বেঁচে আছে। মৃত মায়ের পাশে পড়ে থেকে সে একটু হাওয়া বুকের ভেতর টেনে নেবার জন্য ছটফট করছে।

গায়ের রক্ত আর পিচ্ছিল পদার্থগুলো মুছে ফেলে উর্ণ্টাকে মুক্ত করল হরিচন্দ্। অম্রুর হাতে বাচ্চাটাকে তুলে দিয়ে ভেড়টাকে বয়ে নিয়ে গেল পশ্চিম দিকে। এই পশ্চিম প্রান্তের খাদ অনেক খাড়াই। বহু নিচে পাহাড়ের তলায় একটা খরস্রোতা নালাকে বয়ে যেতে দেখা যায়। হরিচন্দ্ মৃত পশুটাকে জলদেবতা বাতালের নাম করে ছুঁড়ে দিল নিচের নালা লক্ষ্য করে।

ভেড়ের বাচ্চা উর্ণ্টা এক হপ্তা পেরুতে না পেরুতেই বেশ বড়সড় আর তালেবর হয়ে উঠল। অম্রু তাকে বড় একটা কাছছাড়া করে না। ফাঁক পেলেই বাচ্চাটা ছুটে গিয়ে কোন মাদী ভেড়ের বাঁটে খোঁচা মেরে দুধ টেনে খায়। দেখতে পেলেই রুক্কা ঘ্যাগ করে ধমকে ওঠে। ভাবখানা এই, যখন তখন এসব কি কাণ্ড?

রুক্কার কাছে বে-আইনি কিছু চলবে না। উর্ণ্টা এ কদিনেই কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বেশ করুণ গলায় ডাকতে শিখেছে। রুক্কার কাছে ধমক খেয়ে সে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল তার বালক-প্রভুর আশ্রয়ে। অম্রু অমনি তাকে পিঠে চাপিয়ে তার সামনের দুটো পা গলার দু-পাশ দিয়ে বুকের কাছে টেনে ধরে পাক মেরে মেরে ঘুরতে লাগল। কান্না

থামল উর্ণ্টার।

বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তরে সাদা বরফের শত শত তাল যেন সারা দিন ভোর গড়িয়ে বেড়ায়। ভেড় বক্‌রির পাল তো নয়, গদ্দীরা ওদের বলে ধন। যথার্থই ঐশ্বর্য। ওদের ভরণপোষণ, সংসারযাত্রা নির্বাহের সবসেরা অবলম্বন।

পাল পাল ভেড় বক্‌রি চরছে। প্রাণভরে চুরচুর করে ছিঁড়ে খাচ্ছে লম্বা নিরু ঘাস।

এখানে পহালদের বিশেষ কিছু ভাবনা নেই ভেড় বক্‌রি নিয়ে। কেবল সামলে রাখা, যাতে অন্যের সীমানায় গিয়ে না পড়ে। অবশ্য গদ্দী কুত্তরগুলো এ বিষয়ে ভীষণ সজাগ। তারা সীমানা ভেঙে লোভীদের মুখ বাড়াতে দেবে না কোন মতে। যদি মালিকের দুর্মতি হয়, মুলুক সন্ধান বুঝে পাশের জমিতে এগিয়ে দেয় তার দল, তা হলে করার কিছু নেই। ধরা পড়লেই চেঁচামেচি, তুলকালাম। শেষে অপরাধীর সওয়ানায় ভেড়া চরিয়ে শোধ তোলা হয় এই চোরাই কর্মের।

হরিচন্দ্‌ কখনো এ কাজ করে না। সে অল্পে তুষ্ট। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সে মেশে কম, কিন্তু সারাক্ষণ সদ্ভাব রেখে চলার চেষ্টা করে।

বাঁ হাতের মুঠোয় এক গোছা ভেড়ার লোম ধরে ডান উরোতে কোক্‌ড়ির (তক্‌লি) কাঠি চেপে পাক দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছিল হরিচন্দ্‌। ফরফর করে পাক খেতে খেতে বেরিয়ে আসছিল কাত্‌না (সুতো, উল)। নিজের সুতো নিজে কাটে, নিজের পোশাক নিজেই তৈরী করে নেয় হরিচন্দ্‌। এবার থেকে দুটো পোশাক তৈরী করতে হবে তাকে। অমৃরু বড় হয়েছে। এখন থেকে তার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরবে তার ছেলে। ভেড় বক্‌রি চরাবে, পথঘাট চিনবে, পাহাড় পর্বতের মেজাজ মর্জি জানবে।

গংগীর বাপ বেঁচে থাকতে মেয়ে জামাই-এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। নিজের জাতের লোক হলে কি হবে, ব্যবসা করে বড় হয়েছিল

হরিচন্দের শ্বশুর। জাতে মহাজন বৈশ্য না হয়েও মহাজনী কারবার করে অনেক টাকা পয়সা করেছিল মানুষটা। মেয়ে তার বাপের অমতে পালিয়ে গিয়ে একটা চালচুলোহীন গদ্দীকে সাদি করেছিল বলে বুড়ো বয়সে ক্ষেপে গিয়েছিল লোকটা। কিন্তু বুড়ো যেই মরল, তার মাস তিনেকের ভেতর ছেলের জন্ম দিয়ে গংগীও মরল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অমরুর মামা মা-মরা ভাগনের খবর পেয়েই অনেক সাধ্য-সাধনা করে হরিচন্দের কাছ থেকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখল ভাগনেকে। ছেলেপুলে নেই। ভাগনেই হল মামা মামীর চোখের আলো। কিন্তু হলে হবে কি বাপের রক্ত বইছে দেহে। ভেড় চরাবার জন্য ডাক দিতেই এক পায়ে খাড়া।

কোক্ড়িতে পশমী সুতো পাকাচ্ছিল হরিচন্দ্ আর খানিক দূরে ঘাসের জমিনে জুৎ করে বসে রুবানা বাজাচ্ছিল অমরু। তারের উপর দিয়ে কচি কচি আঙুলগুলো খেলা করে যাচ্ছিল। ভারী মিষ্টি একটা সুর রুবানা থেকে বেরিয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল। সবুজ ঘাস, নীল আকাশ, সাদা সাদা বরফের চূড়োর কথা বেজে বেজে উঠছিল রুবানার সুরে। হরিচন্দ্ কাজের ফাঁকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল ছেলেকে। একেবারে গংগীর মুখখানা বসানো। শেষ বেলার কোমল আলোটুকু অমরুর মুখে অদৃশ্যলোক থেকে কে যেন মাখিয়ে দিচ্ছিল। অমরু বাজিয়ে চলেছে। থেমে গেছে হরিচন্দের হাতের কোক্ড়ি। সে ঘাসের ওপর বসে পড়েছে। সূর্যাস্তের লাল আভা ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে সাদা তুষার পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়। হঠাৎ হরিচন্দের চোখের সামনে ফুটে উঠল দশ বছর আগেকার একটা ছবি। গংগীর হাত ধরে সে চলেছে সাচ জোতের দিকে। ভারধুপের (মধ্যাহ্ন) অনেক আগেই পেরিয়ে যেতে হবে জোৎ। না হলে শুরু হয়ে যাবে বিয়ানা (ঝড়)। সে ঝড় সহজে থামবে না। কিন্তু গংগীর ভারী কষ্ট হচ্ছিল জোর কদমে হাঁটতে। তিন মাস আগে সে যখন এই পথে গিয়েছিল তখন অমরু ছিল পেটে। কষ্ট হয়নি তার পথ চলায়। গদ্দী মেয়েরা ভারী কষ্ট-

সহিষ্ণু। তাদের প্রসব বেদনার বালাই নেই। হরিচন্দ্ সেদিন বউ-এর হাত ধরে চলতে চলতে ভাবছিল তার ঠাকুমার কথা। বনে কাঠ কুড়োতে গিয়ে তার বাপকে প্রসব করেছিল। তারপর ছেলের নাড়ি কেটে, কাঠের বোঝা আর ছেলে বেঁধে নিয়ে ঘরে ফিরেছিল।

হরিচন্দ্ ভাবছিল, জোতটা ঠিক সময়ে পেরিয়ে গিয়ে ওপারে যা হয় হোক্। হয়ত ঘরে ফিরে গিয়েই বাচ্চা হবে গংগীর। কিন্তু ওপর-ওয়ালার মনে কি আছে কে জানে। হরিচন্দ্ সেদিন পথ চলতে চলতে মণিমহেশ আর ছোড়্লেবালীর নাম ঘন ঘন জপ করছিল। কিন্তু পা চালাতে চাইলেই কি আর পা চলে। প্রসবের সময় তখন ঘনিয়ে এসেছে গংগীর। সাচ জোত আর পার হওয়া গেল না। ভাবধূপ কখন পেরিয়ে গেছে শুরু হয়ে গেছে বিয়ানা। প্রচণ্ড আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ছিল পাহাড় থেকে পাহাড়ে। মাঝে মাঝে সে আর্তনাদ থেমে গিয়ে একটা গোঙানির শব্দ থেকে থেকে উঠে আসছিল। বরফ ছাওয়া ল্যাসে (মেষচারকদের চড়াই উৎরাই-এর আগে পরের আস্তানা) তখন হরিচন্দ্ ভেড় বক্রির পাল আর বউ নিয়ে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। অসুজের (আশ্বিন) শেষ হতে চলল, হাইউন্দ্ বা শীত শুরু হয়ে গেছে, ওপরের পাহাড়ে। হরিচন্দের মনে হল, আরও আগে উড়ন্ধার ছেড়ে চলে এলে ভাল হত। কিলাড় ছেনছেল্লা মাও তাই বলেছিল। কেবল গংগীর জায়গাটা ভাল লেগে যাওয়ার জন্য সে থেকে গিয়েছিল সবার পেছনে। পহ্লরা যে যার ভেড় বক্রি নিয়ে উড়ান্ধারের কাণ্ডা খালি করে চলে গেল হরিচন্দ্ ঘরে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলে গংগা তার হাতখানা টেনে ধরে বলেছিল, পাঙ্গী ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে নাগো।

ব্যস, গংগীর ঐ একটা আবদারই যথেষ্ট। হরিচন্দ্ শূন্য উড়ান্ধারে বউকে নিয়ে আরও পনের রোজ কাটিয়ে দিয়েছিল। গংগীর হাত ধরে সারা কাণ্ডা চষে বেড়াতে গিয়ে তার মনে হত, চম্বার রাজাবাহাদুরের সঙ্গে তার কোন তফাৎ নেই। সারা উড়ান্ধার তার রাজ্য।

সেদিন বিয়ানার সঙ্গে সঙ্গে হেন্ট্ (তুষারপাত) শুরু হয়ে গিয়েছিল। বায়ু-তাড়িত তুষার ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছিল। সারা ল্যাস বরফের পুরু আস্তরণে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। গংগীর পা দুখানা গাড়্রুতে ঢেকে তাকে জড়িয়ে বসেছিল হরিচন্দ্। ভেতর থেকে কেমন যেন একরকম শ্বাস টানছিল গংগী। মহাজন বাড়ীর আদুরে মেয়ে পথের এত কষ্ট সইতে পারবে কেন। সারা আকাশ, বরফের চূড়া, চন্দ্রভাগা আর অগুনতি নদানালা ফিকে রক্তের রঙে রাঙিয়ে সূর্য ডুবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল কলেল। সেই ভয়াল সন্ধ্যার কথা মনে হলে হরিচন্দের বুকের খুন থেমে যায়। থমথমে অন্ধকার। তার ভেতর থেমে আসা হাওয়ার গোঙানি একটা আহত দৈত্যের দীর্ঘশ্বাসের মত মনে হচ্ছিল। ভয়ঙ্করভাবে আহত রাক্ষসটা তার কালো দেহখানা চরাচরের ওপর ফেলে দিয়ে যেন মরণকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য জোরে জোরে কয়েকটা শ্বাস টানছিল। মাঝ রাতের দিকে সে শ্বাস একেবারে থেমে গেল।

চরাচর নিস্তব্ধ। শবের মত প্রচণ্ড এক শীতলতায় রাতটা মূক হয়ে আছে। গংগীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে বসে থাকতে থাকতে ঢুলুনি এসে গিয়েছিল হরিচন্দেব। কত রাত পর্যন্ত বসেছিল মনে নেই। হঠাৎ বুকের মাঝখানে একটা আলোড়ন। গংগী ছটফট করছে। কিছু সময়ের ভেতরেই গংগীর দেহের আক্ষেপ থেমে গেল! ক্ষীণ একটা কান্নার শব্দ বেরিয়ে এল তার গলার ভেতর থেকে। হরিচন্দ্ হাতড়ে দেখল গংগীর দেহটা অবশ হয়ে এলিয়ে পড়েছে। একি! একটা মাংসের পিণ্ডের মত কি যেন হাতে ঠেকল। পাথরের টুকরোয় রুনকা ঘষে ভূর্জ পাতায় আগুন ধরিয়ে কাঠ জ্বালল হরিচন্দ্। তুষার ছাওয়া অন্ধকার রাতে ধিক ধিক করে আগুন জ্বলছে। দেখা গেল জনমানবহীন প্রান্তরে ভূমিষ্ঠ হয়েছে একটি মানবশিশু। বরফের চাদরের ওপর প্রাণহীন মায়ের দেহটাকে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিয়ে শিশুটিকে নিজের বুকে চেপে ধরে আগুনের তাপ দিতে লাগল হরিচন্দ্। উত্তর আকাশের

দিকে হঠাৎ তার চোখ গিয়ে পড়ল। বিহাম্নু তারা জাস্‌কারের চূড়ায় জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। ঘোর বিপদেও গদ্দীকে উতলা হতে নেই। সে শিশুটিকে শূন্যে দু-হাতে তুলে ধরে ধ্রুব নক্ষত্রকে নমস্কার জানাল।

রুবানা ফেলে এখন বাঁশুরী বাজাচ্ছে অম্‌রু। মিষ্টি সুর ভেসে চলেছে সন্ধ্যার প্রান্তরে। পাশের পাহাড়ে সে সুরের একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি উঠছে।

ঘোর কেটে গেছে হরিচন্দের। এই মুহূর্তে ছেলের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, বাঁশুরীতে অম্‌রু তার হারানো মাকে ডেকে চলেছে। আর ঐ পাহাড়ের আড়ালে থেকে গংগী বলছে, এই যে বেটা, এই তো আমি।

॥ দুই ॥

শ্যারি উৎসবের ধুম পড়ে গেছে উলাংসা গ্রাঁতে। অসুজ মাস, শ্যার ঋতু। লাহুল, স্পিতি, পাঙ্গীর চারণ শেষ করে সবে ঘরে ফিরেছে গদ্দীরা। মক্‌কি তোলার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন গাঢ় সোনালী রঙের মক্‌কি শুকোচ্ছে গৃহস্থের ঘরের ছাদে। সৈরী (শরতের ফসল) তোলা হয়ে গেলেও কানক বা গমের বীজ বোনার জন্যে ক্ষেতি তৈরীর কাজ শুরু হয়নি কিষাণদের ভেতর।

ভারধূপ পার করে উলাংসার যুবক-যুবতীরা সার বেঁধে চলেছে বনের দিকে। ওরা ওদের গাদেরানে প্রচলিত বহু পুরাতন প্রেমের গান ধরেছে। গানটি আজকের শ্যারির সঙ্গে খাপ খায় না। কারণ শ্যারি শরৎকালের আনন্দ উৎসব, আর এ গানটি বড় দুঃখের। তবু গদ্দী তরুণ-তরুণীরা একসঙ্গে মিলিত হলে এ গান গায়। তাদের মনের না পাওয়ার দুঃখ এই গানের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়। গরীব আর বড়ঘরের চিরদিনের বিভেদ নিয়ে এ গান। ফুল্‌মু ভারী মিষ্টি মেয়ে, কোমল তার মন। সে ভালবেসেছিল বড় ঘরের

একটি ছেলেকে। ওদের গোপন ভালবাসার খবর পেয়ে জোর করে ছেলের অভিভাবকেরা অন্যত্র ছেলেটির বিয়ের ব্যবস্থা করল। নিরুপায় দুঃখী মেয়েটি আত্মহত্যা করে বসল।

বিয়ের শোভাযাত্রা যখন এসে পৌঁছল একটা খরস্রোতা নালার ধারে তখন সেই হতভাগ্য মেয়েটির শবযাত্রাও এসে পৌঁছল সেখানে। ছেলেটি যখন শুনল এ তার আনটন (প্রেমিকা) ফুল্‌মুর মৃতদেহ তখন সে তার সামনের খরস্রোতা নালায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করল।

ছেলেরা গান ধরেছে, মেয়েরাও যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে।

গাড়ুয়ে বিছাড়ুয়ে ফুল্‌মু
কিযো ঝাক্‌দি
ঝাকা কিযো মার্‌দি
দো হাথ বুটনে দে লানে জানি
গলাঁ হুয়ে বেতিয়াঁ।

বনের চড়াই পথে ছেলেরা উঠে গিয়েছে আগেভাগে। তারা ক্যায়ল বনের তলায় পৌঁছে ফিরে দাঁড়িয়ে গান ধরেছে। মেয়েরা নিচে দাঁড়িয়ে ছেলেদের গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইছে।

ওয়ারে ওয়ারে রঞ্জদি
যাননি চলে পারে পারে
ফুল্‌মুদি লাস যানি
গলা হুয়ে বেতিয়াঁ।

এই গান গাইতে গাইতেই ওরা পরস্পরের হৃদয় সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠছে। এখানে ছেলেমেয়েরা মনে মনে নির্বাচন করে নিচ্ছে তাদের আনটি, আনটন বা প্রেমিক প্রেমিকাকে।

একটা সোজা সবুজ ক্যায়ল (চীর পাইন) গাছের তলায় বাইশ বছরের যুবক অমরু ঠিক যেন তরুণ একটা গাছের মত দাঁড়িয়ে আছে। সবার গলার আওয়াজ ছাপিয়ে উঠেছে তার গলা। বাঁশুরীর সুর সাধা হচ্ছে তার গলায়।

দলের কয়েকটি মেয়ে উৎসুক হয়ে উঠেছে এই নবীন যুবা পুরুষটি সম্পর্কে।

বাবার শ্রাদ্ধের কাজ শেষ করে মাস দুয়েক হল সে সরল উপত্যকা থেকে এসেছে উলাংসায়। এখানে একসময় তার পিতৃপুরুষের ভিটে ছিল। হরিচন্দ্ মরার আগে অম্রুকে একবার এই ভিটের দখল নিতে আসার জন্য বলেছিল। তাই বাপ মারা যাবার পর সে এসেছে তিরিশ মাইল পথ পেরিয়ে সরল থেকে উলাংসায়। জীবনের শেষ ক'টা দিন ভাগ্য বিপর্যয়ে কেটেছিল হরিচন্দের। হেন্ (তুষার স্তূপ) চাপা পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল তার ভেড় বক্‌রির পুরো দলটা। বৃদ্ধ, বহু যুদ্ধের সেনাপতি রুক্‌কা তার বাহিনীর সঙ্গে হাজার হাজার মন বরফের স্তূপের তলায় সমাধিস্থ হয়েছিল। অর্ধপ্রোথিত হরিচন্দকে বরফের তলা থেকে টেনে বের করে এনেছিল অম্রু। দুর্ঘটনার হাত থেকে আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল সে। বাপকে সারা পথ কাঁধে করে বয়ে আনতে হয়েছিল তাকে। পঙ্গু হরিচন্দকে নিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় প্রায় দুটো বছর লড়াই চালিয়েছিল অম্রু। ভেড় বক্‌রির ধন নেই। নেই অন্য কোন সম্বল। হরিচন্দ্ ভবিষ্যতের জন্যে কাঁচা টাকা কখনো সঞ্চয় করে রাখেনি। যখনই পশম বেচে টাকা এসেছে হাতে তখনই কিনে ফেলেছে নতুন ভেড় আর বক্‌রি।

বনে ঠিকাদারের কাঠ কেটে পয়সা রোজগার করেছে অম্রু। ভাঙা রাস্তা মেরামতির কাজ করে মজুরী নিয়ে এসেছে সে। বাপকে সেবা করেছে প্রাণপণ। অভাব কি তা বুঝতে দিতে চায়নি হরিচন্দ্‌কে। কিন্তু বিছানায় পড়ে থেকেও সব বুঝতে পারত হরিচন্দ্। অম্রুর দুর্দশার কথা ভেবে তার চোখ উপচে আঁসু গড়াত। অম্রু দেখতে পেলেই মুছিয়ে দিত বাপের চোখের জল। বলত, তুমি কাঁদছ কেন বাপুজী, আমি আবার ভেড় বক্‌রির দল গড়ব।

ছেলের কথা শুনে কান্না থেমে যেত হরিচন্দের। অম্রুর হাতখানা চেপে ধরে বলত, ভেড় বক্‌রি গদ্দীর কাছে সব সে বড় ধন বেটা। অন্য

ধনের লালচে একে ভুলবি না কখনো। আমার রাস্তা যেখানটায় ভেঙে গেল, ঠিক সেখান থেকে তৈয়ার কর তোর রাস্তা। কেহ্‌লু বীরের (পাহাড়ের দেবতা) গুস্‌সা হয়েছিল তাই হেন্‌ গিরল। কেহ্‌লু বীরের পূজা করতে ভুলবি না।

উৎসবের অঙ্গ হিসেবে কাটা হল একটা লম্বা ক্যায়ল গাছ। মসৃণ করে ছাঁটা হল তার ডালপালা। এবার গাছটাকে যুবকরা ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে এল একটা ফাঁকা জায়গায়। মেয়েরা জায়গাটার তিন দিক ঘিরে দাঁড়াল। আর ছেলেরা ভাগ হয়ে গেল দু' দলে। এবার গাছটাকে শূন্যে তুলে দুদিকে টানতে লাগল প্রতিযোগীরা। শেষের যুবকটিই প্রধান খুঁটির কাজ করছে। একপক্ষে গাছের শেষ প্রান্ত ধরে দলপতির দায়িত্ব নিয়েছে অমৃরু। টানাটানি চলেছে দু' দলের। ঐ ভারী গাছখানা যেন মাটিতে না পড়ে। মেয়েরা দেখছে আর হৈ হুল্লোড় করে হাসি ছড়াচ্ছে। কিছুক্ষণের ভেতরেই অমৃরুর দল হিড়্‌ হিড়্‌ করে প্রতিযোগী দলটিকে টেনে নিয়ে পেছন দিকে চলতে লাগল। সীমারেখা না পেরুলে জয়ী হওয়া যাবে না, তাই সবেগে টানতে লাগল অমৃরুর দল। সীমা পেরিয়ে গেছে। পরাজিতদের মুখ বিজয়ীদের সীমারেখার দিকে, তাই তারা বুঝতে পারছে সীমানার চিহ্ন। কিন্তু অমৃরুর দল পিছু হটতে গিয়ে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, তাই টেনে চলেছে প্রাণপণ।

অমৃরু যখন মেয়েদের গলায় আর্ত হুঁশিয়ারির আওয়াজ শুনল তখন তার করার কিছুই নেই। সবাই বনের এই জায়গাটার অবস্থান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেও অমৃরু নবাগত বলে তার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। সে উৎসাহে প্রবল বিক্রমে গাছটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে পড়ল একটা ঢালু জায়গায়। সবাই ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে গাছটা। হৈ হৈ করে একটা গাছে ডোর (গদ্দীদের কোমরে জড়ানো ছাগলোমের দড়ি) বেঁধে কয়েকজন নেমে পড়ল নিচে। দুটো গাছের ফাঁকে আটকে যাওয়ায় বড় বাঁচান বেঁচে গেছে অমৃরু। খালি কপালের খানিকটা অংশে চোট

লেগে রক্ত ঝরে পড়ছে।

ধান্‌নি দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে। উলাংসার পাশে হোলি গ্রাঁতে তার বাড়ী। সে বাউড়ি (পাহাড়ের ফাটল থেকে চুইয়ে পড়া জলধারা) থেকে জল নিয়ে যেতে এসেছিল। শ্যারির হল্লা শুনে ওপারের বন পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল উৎসবের জায়গায়। হাতে ছিল তার খালি ঘড়েলুখানা (ঘড়া) অম্‌রুকে খাদ থেকে ওপরে তুলে আনার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ঢালার জন্য জলের দরকার হয়ে পড়ল। কিন্তু কাছে পিঠে নালা নেই আর কারু হাতে জল আনার পাত্রও নেই। গ্রাঁয়ের বসত এলাকা ছাড়িয়ে ওরা উঠে এসেছে অনেকখানি পথ।

চক্ষের নিমেষে ধান্‌নি ঘড়েলু কাঁধে বন চিরে ছুটল বাউড়ির দিকে। জল ভরে নিয়ে উৎসবের জায়গায় ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে।

ফাঁকা জায়গায় শুইয়ে রাখা হয়েছে অম্‌রুকে। সে সব ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে দাঁড়াতে চেয়েছিল কিন্তু জোরে তাকে চেপে ধরে রেখেছে দোস্ত্‌রা।

ঘড়েলু থেকে একটি ছেলে জল ঢেলে ঢেলে দিতে লাগল আর ধান্‌নি তার ঘুন্‌ডি ভিজিয়ে মোছাতে লাগল অম্‌রুর কপালের রক্ত।

উঠে বসে আঁজলা ভরে জল খেল অম্‌রু। কতক্ষণ পরে বেশ খানিকটা সুস্থ হয়ে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল সে।

ছেলেমেয়েরা অম্‌রুকে ঘিরে হৈ হৈ করে নাচ জুড়ে দিলে। বিজয়ী দলপতি উঠে দাঁড়িয়েছে। এবার আসল উৎসবের শুরু।

মেয়েরা পাত্র ভরে এনেছে পানীয়। লুগ্‌রী মদ। বাটি ভর্তি করে সে দারু পরিবেশন করা হচ্ছে যুবকদের। তারা মাঝে মাঝে হাত থেকে বাটিটা নামিয়ে রেখে প্রবল বেগে একটা লাফ মেরে ঘুরে ঘুরে ঘুর্ণির মত নাচছে। মেয়েরা হাততালি দিচ্ছে আর গান গাইছে। সন্ধ্যায় আকাশে চানানি দেখা দিলেই ওরা দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে ফিরে যাবে গ্রাঁতে (গাঁ)।

ধান্‌নি ওদের পানোৎসব শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সবার চোখ এড়িয়ে গা ঢাকা দিলে বনের মধ্যে। কলেল ঘনিয়ে ওঠার আগেই তাকে ফিরতে হবে হোলিতে। বাউড়ি থেকে জল ভরে নিয়ে ফিরবে সে। ক'দিন আগেও ওপরের পাহাড় থেকে মকৃকি খেতে নেমে এসেছিল রীচ (ভালুক)। বনের পথে রাতে দু' চারজন পথচারীকে আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছে। পালাতে হবে তাড়াতাড়ি। বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

বনের ভেতর ঝোপঝাড়, গাছপালার জটলায় শেষ বেলাতেই কলেল ঘনিয়ে উঠেছিল। ধান্‌নি ঘন ঝোপের ভেতর শুনতে পাচ্ছিল শীতু পোকার ডাক। ঠিক যেন বলছে, 'শ্যার আঙ্গৈ, শ্যার আঙ্গৈ'—শীত এল, শীত এল।

পরের দিন পড়ন্ত বেলায় বাউড়িতে জল আনতে এসে দূর থেকে একটা সুর শুনতে পেল ধান্‌নি। সে থমকে দাঁড়াল। বাঁশুরি বাজাচ্ছে কেউ। তার মনে হল, এমন মিঠে সুর সে শোনেনি কখনো।

ধীরে ধীরে বাউড়ির ধারে এসে হঠাৎ আবিষ্কার করল বাঁশুরিয়াকে। একটা প্রি গাছের তলায় হেলান দিয়ে বসে কালকের উৎসবের সেই আহত ছেলেটি বাঁশুরি বাজাচ্ছে।

ধান্‌নিকে দেখে অম্‌রু বাঁশুরি থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। হেঁকে বলল, বেশ মেয়ে তো তুমি! কাল শ্যার থেকে গা ঢাকা দিলে!

মিষ্টি করে হাসল ধান্‌নি। বলল, অন্যের লুগ্‌রিতে আমি ভাগ বসাই না।

তবে অন্য পুরুষ জেনে তুমি তার সেবা করতে গেলে কেন?

সেবা জেনানার ধরম।

হাতছানি দিয়ে অম্‌রু প্রি গাছের কাছে ডাকল ধান্‌নিকে। ধান্‌নি মাথা নেড়ে জানাল সে অম্‌রুর ডাকে সাড়া দেবে না। পিঠের ওপর পড়ে থাকা বিমুনীটা মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল। ধান্‌নি ঘড়েলু ভরে জল তুলতে লাগল বাউড়ি থেকে, আর আড়চোখে সুঠাম যুবা পুরুষটির দিকে তাকাতে লাগল।

অম্‌রু আবার বলল, ভয় নেই রীচ (ভালুক) কিংবা লক্কর বাঘা নই আমি।

ধান্‌নি চেঁচিয়ে বলল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

তবে ?

তবে আবার কি ?

তুমি কাল একটা চোটলাগা মানুষের সেবা করলে তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে এলাম।

ধান্‌নি বলল, ওটুকু যে কেউ করত।

কি নাম তোমার ?

ধান্‌নি।

আমি অম্‌রু। কোন গাঁয়ের মেয়ে তুমি ?

কি দরকার মশাই ? আমার কোঠিতে চড়াও হবে নাকি ?

সে ভয় নেই। আমি তো চম্বার রাজার সেপাই নই যে তোমার ঘরে গিয়ে হামলা করব।

ধান্‌নি মনে মনে বলল, তুমি কারু ঘরে গিয়ে দাঁড়ালে সে মেয়ে কৃতার্থ হয়ে যাবে। মুখে বলল, হোলি। আঙুল তুলে দেখিয়েও দিলে গাঁটা।

পেছনের ডোরে গুঁজে রাখা একখানা ঘুন্‌ডি ডান হাতে সট করে টেনে নিয়ে হাওয়ায় ওড়াতে ওড়াতে অম্‌রু বলল, এই ঘুন্‌ডিখানা কুড়িয়ে পেয়েছি। যার ঘুন্‌ডি সে এখানে এসে নিয়ে যেতে পারে

বাউড়ির ধারে ঘড়েলুখানা ঠিক করে বসিয়ে রেখে পাথরের চাঁই-এর ওপর পা ফেলতে ফেলতে একটা উড়ুক্কু কাঠবেড়ালীর মত হৈ হৈ করে চড়াই ভেঙে উঠতে লাগল ধান্‌নি। ঘড়েলুখানা ততক্ষণে গড়িয়ে পড়েছে। বক্ বক্ আওয়াজ তুলে সে গাল পাড়তে লাগল ধান্‌নিকে।

অম্‌রুর কাছে পৌঁছে ধান্‌নি তার কালকের ফেলে আসা ঘুন্‌ডিটা ছিনিয়ে নেবার জন্যে হাত বাড়াল। প্রি গাছের একটা ডালে অম্‌রু ঘুন্‌ডিখানা ঝুলিয়ে দিলে। দু' তিনবার লাফিয়ে নাগাল না পেয়ে স্থির

হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল ধান্‌নি। যা আশা করেছিল ঠিক তাই হল। অম্‌রু ঘুন্‌ডিখানা জড়িয়ে দিলে ধান্‌নির মাথায়। অমনি হু' চোখের অবাক করা দৃষ্টি অম্‌রুর মুখের ওপর ফেলে ধান্‌নি বলল, উলাংসায় থাক তুমি? ওখানে তো রথীদের বাস।

আমি সবে উলাংসায় এসেছি। আমার হু' পুরুষ আগের মানুষরা উলাংসাতেই থাকত। আমি জাতিতে রথী।

আশ্বস্ত হল ধান্‌নি, হোলিগ্রাঁয়ের অধিকাংশই রথী। কেবল দূরের একটা শৈলশিরায় কিছু হোলিয়া জাতের লোক বাস করে।

ধান্‌নি বলল, উলাংসায় এসেছ কেন?

আমার পুরোনো বসতবাটির দখল নিতে। আর—।

আর কি?

অম্‌রু আমতা আমতা করে বলল, কি জাতের লোক হোলিতে বাস করে?

মুখ টিপে হাসি চেপে ধান্‌নি বলল, তা জেনে তোমার লাভ?

অম্‌রু অমনি বলল, নিজের জাতের মানুষ হলে সাদি টাদি করা যেত।

ধান্‌নি বলল, অনেক রথী আছে হোলিতে, বল তো ঘটকালি করি।

তোমার কি সাদি হয়ে গেছে?

খিল্ খিল্ হাসি ছড়িয়ে ঘুন্‌ডি উড়িয়ে বাউড়ির তলায় নেমে গেল ধান্‌নি। নিচে পৌঁছে নাক উঁচিয়ে আঙুল তুলে দেখালে। নাকে কোন গয়না নেই তার। বিয়ে হলে তো নাকে সে সোনার বালাং ঝোলাবে। মাথায় বাঁধবে লাল ফিতে।

পরের দিন আবার দেখা। কথা হয়, হাসি হয়, তবু ধরা দেয় না ধান্‌নি। শেষে সাত দিনের দিন ধরা পড়ল রঙে ঝলমল নেল্ পাখিটা।

চিঁউ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কথা দিয়ে গেল ধান্‌নি, সে অম্‌রুকে ছাড়া আর কাউকে সাদি করবে না। তুনিয়া জাহান্নামে গেলেও না।

অম্‌রু বলল, তোমাকে সাদি করতে গেলে তো কড়ি লাগবে এক কাঁড়ি। তোমার মাতাজী কি জামাই-এর কাছে অল্প কড়ি পেয়ে তুষ্ট হবেন?

ধান্‌নি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, চার চারটে বাওয়াল পিতাজীর সাতশো ভেড় কুগ্‌তি জোৎ পেরিয়ে লাহুল নিয়ে যায়। সে বাড়ীর মেয়ে আনতে গেলে কড়ি ঢালতে হবে না?

ভারী ভাবনায় পড়লাম ধান্‌নি। কি উপায় করি? জাতের বাধা দূর হয়েছে, এখন কড়ির পাহাড় তুলি কি করে?

ধান্‌নি ঘড়েলু মাথায় তুলে নিয়ে পা চালাতে চালাতে বলল, তা আমি কি জানি। সাদির সাধ হয়েছে কড়ি যোগাতে হবে বৈকি।

আরে শোন, শোন—অম্‌রু ফেরাল ধান্‌নিকে। বলল, তোমার পিতাজীর তো একপাল ভেড় বক্‌রি, তাই না?

কথার সমর্থনে ধান্‌নি মাথা ঝাঁকাল।

আচ্ছা, এতগুলো বাওয়ালের পেছনে খরচ হচ্ছে কত? ভেড় চরাতে এক একজন কত পায়?

ধান্‌নি মাথা থেকে ঘড়েলু নামিয়ে রেখে একটা পাথরের চাঁই-এর ওপর বসল। আঙুলের রেখায় আঙুল ঠেকিয়ে হিসেব দেবার ভঙ্গীতে বলতে লাগল, মক্‌কির আটা পাক্‌কা তিরিশ পাথ (আশি কিলো)। সাথে আছে নিমক আর মর্‌চা। পাহাড় থেকে অম্‌লুর পাতা তুলে ও চাটনি বানাবে নিজে। ভেড় বক্‌রির তুধ যত খুশি পিও, মানা নেই।

অম্‌রু জানতে চাইল, মাসে মজুরী কত?

ছে রূপিয়া। আর তিন মাহিনা বাদ ঘর ফিরলে এক ভেড়।

পোশাক?

পুরা উলের চোল, ডোর, টোপী। এক জোড়া জুটা। একখানা সুতি কুর্তা। দো গাড়্‌রু (কম্বল)। তুমি কি পহালদের এসব কানুন

জান না নাকি ?

অম্রু বলল, আমি যদি পাঁচ বরষ তোমার পিতাজীর কোঠিতে ঘর-জোয়াস্ত্রী থেকে ভেড় বক্‌রি চরাই আর সাদির টাকা শোধ দি ?

ধান্‌নি বলল, সে কানুন তো আছে। তবে ওতে বহুৎ ঝামেলা। কখন শ্বশুর জামাই হাতাহাতি হয়ে যায়। হোলি গ্রাঁতে তিন ঘর এমনি হয়েছে। জামাইকে তাড়িয়েছে মেয়ের বাপ। এক পহাল তো টাকা শুধ্‌তে শুধ্‌তে বুড্‌ঢা হয়ে গেল। পাত্রীর সাদি হল ভিন জায়গায়।

অম্রু বলল, কথাটা তুললাম তবে আমারও ওতে দিল সায় দেয় না।

ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে ধান্‌নি কি ভাবল। একসময় উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। যেন সমস্যার সমাধান হয়েছে, এমনি ভাব দেখিয়ে বলল, বির্তন (বিশেষ প্রয়োজনে বন্ধু পাতানো) করে টাকা ধার নাও, ফি বরষ শোধ দিও।

অম্রু হাসল। কপালে হাত চাপড়ে বলল, আমি তো নতুন এসেছি উলাংসায়। বির্তন করতে গেলে সব জাতের, সব রকমের লোকের সঙ্গে মিশতে হবে। বহুৎ রোজ একসাথে থাকলে তবে তো বির্তন হবে। আমার উলাংসায় খালি কোঠির জমিনটুকু ছাড়া এক বিশোয়া ক্ষেতি নেই। কে ভরসা করে আমায় বির্তন বন্ধু বলে বিয়েতে রূপিয়া হাতে তুলে দেবে ?

ধান্‌নি বলল, অল্প অল্প করে বির্তন-বন্ধুরা টাকাটা জোগালে কারো গায়ে লাগবে না। ঐ তো দেখলাম, শ্যার উৎসবে সবাই তোমাকে কত খাতির করছে।

অম্রুর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে অমনি বলল, কাংড়ায় একবার মামার বাড়ী ঘুরে আসি, দেখি কিছু ব্যবস্থা করে উঠতে পারি কিনা।

ধান্‌নি ভীষণভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, সে তো বহুৎ দূর। তুমি

একবার পালালে আর আসবে না।

অম্‌রু বলল, ধান্‌নি, আন্‌টন্‌ আন্‌টির দিল যে ডোরে বাঁধা সে ডোর আশমান জমিন লম্বা। দুনিয়ার যে কিনারে যাও ডোরে টান পড়লেই ফিরতে হবে।

তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে বলে গজ-কা-জোৎ পেরিয়ে কাংড়া যাওয়া স্থির করল অম্‌রু। উলাংসা থেকে নেমে এল খাড়ামুখ। রাতটা কাটিয়ে দিলে এক বন-রক্ষকের ঘর ভাগাভাগি করে নিয়ে। যেখানে যায় সেখানেই তার খাতির। গান বাজনা জানে, খাতির তার সর্বত্র। ভোর হতে না হতেই আবার যাত্রা। কোড়্‌লায় দু' চারখানা দোকান। একটা দোকানে নোহারি (ভোরের জলযোগ) সেরে গদ্দী পহালদের মত পাথরের চাঁই-এর ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলল অম্‌রু। উরেই আর ঘাটোর গ্রাঁ ডাইনে বাঁয়ে রেখে ঢুকে পড়ল সে চৌলাধারে। ক'দিন একটানা পথ চলার পর ভেড় বক্‌রির একটা পালের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। শেষ দলটি শীতের চারণের জন্য নেমে চলেছে নিচে কাংড়া উপত্যকায়। পহালটির বয়স হয়েছে। ওরা তুন্দা থেকে আসছে। বেশ কয়েক দিন ধরে হাঁটছে ওরা। সম্ভবত বুড়ো মানুষ বলে চলার গতি হিসেবের বাইরে। ভাল লেগে গেল মানুষটিকে অম্‌রুর। একটা তোষ গাছের মোটা গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে গুড়ুক টানছিল। হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে বলল, কোথায় যাওয়া হচ্ছে বেটা ?

ধরমশালা।

আরে আমিও তো ঐ পথেই চলেছি।

অম্‌রু জানতে চাইল, গজ-কা-জোৎ পেরিয়ে যাবেন তো ?

চৌলাধারে পৌঁছে আর কোন পথে পাহাড় ডিঙোবো বেটা ?

অম্‌রু দেখল, দূর থেকে মানুষটাকে যত বুড়ো ভেবেছিল, তার চেয়েও অনেকখানি বেশী বয়েস তার। এ বয়েসে এতখানি পথ

ঘোরাঘুরি করা বড় একটা চোখে পড়ে না।

অম্রু বলল, অবাক কথা! আপনি এ বয়েসেও এতখানি পথ পার হয়ে চলেছেন?

বুড়োর হুঁকো টানা থেমে গেল। আকাশের দিকে বাঁ হাতের তর্জনীটা তুলে ধরে বলল, ঐ যে উনি, উমর কত? ঐ যে দেহারা (সূর্য) গো। আকাশে যিনি সৃষ্টিকাল থেকে জ্বলছেন আর চলছেন।

অম্রু বলল, সে কথা ঠিক।

বুড়ো উত্তেজিত হয়ে উঠল, ঠিক মানে? আলবৎ ঠিক। চলছে বলেই জিন্দা আছে, থামলেই মরবে। যে চলবে সে জিন্দা থাকবে।

বড় দামী কথা বললেন বুড়ো বাবা।

বুড়ো খুশী হয়ে অম্রুর পিঠে হাত রেখে বলল, গদ্দী পহাল জন্মেছে চলার জন্যে। চলা থামলে তার আর কি রইল বেটা? এই যে এতখানি পথ পার হয়ে এলি, কতগুলো খদ, নালা, নালু, ছই, কুহল পেরিয়ে এলি বল তো? কখনো চেয়ে দেখেছিস বেটা ওদের চলা? দৌড়ে পাহাড় কেটে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তবে—

বুড়ো থামল দেখে অম্রু বলল, তবে কি, বুড়ো বাবা?

ওদের চলা স্রেফ তলার দিকে, আর গদ্দীর চলা নীচু, উপর দু' দিক। আমরা নাচে যেমন নামছি, পাহাড়ে তেমনি চড়ছি।

আবার ভুড়ুক ভুড়ুক নারেলি টানতে লাগল বুড়ো।

সন্ধ্যার ছায়া নামছে। পশ্চিমের পাহাড়ের আড়ালে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। অম্রু উঠে দাঁড়াতেই বুড়ো বলল, যাচ্ছ কোথা?

একটা আস্তানার খোঁজে। কাল তড়্কাতে (ভোর) জোৎ পার হয়ে যাব।

বুড়ো হেসে বলল, আজ রাতে এর চেয়ে ভাল আস্তানা এ তল্লাটে মিলবে না।

অম্রুর চোখ গিয়ে পড়ল পাশের পাহাড়টার বাঁকে। কতকগুলো ভেড় বক্‌রি পুটুর পুটুর করে ঝোড়ঝোপের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

বুড়ো ঘাড় ঘুরিয়ে ডাক পাড়লে, ঘুঙরী…ঘুঙরী…ঈ…।

অম্রু একটি মেয়ের গলার আওয়াজ পেল পাহাড়ের আড়াল থেকে। একটু পরেই ভেড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে মেয়েটি সামনে এগিয়ে আসতে লাগল। কুত্তরটা আগেভাগে দৌড়ে এসে অপরিচিত অম্রুকে বুড়োর সামনে দেখে শুঁকে শুঁকে পাক খেতে লাগল। অম্রু দেখল, মেয়েটি তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে। ভেড় বক্রির ছোট্ট দলটা এগিয়ে আসছে। বুড়ো আবার হাঁক পাড়ল। সম্ভবত মেয়েটির সঙ্গে অম্রুর আলাপ করিয়ে দিতে চায়।

এবার মেয়েটি এগিয়ে আসছে। ধান্নির চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট হবে। বুড়োর মেয়ে নিশ্চয়ই। কিন্তু এ কি! এ যে খোঁড়া। একটা পা টেনে টেনে চলেছে।

সেই ছায়া নেমে আসা দিনান্তে মেয়েটির জন্যে বুকের ভেতর কষ্ট অনুভব করে অম্রু।

খাওয়ার পাট চুকল একসময়। অম্রুর মনে হল, অনেকদিন পরে সে এমন তৃপ্তিদায়ক একটা ভোজ খেল। কি যত্ন করে তাদের খাওয়ালে এই খোঁড়া মেয়েটি। কানকের (গম) চাপাটির সঙ্গে দাল। তার ওপর ভ্যান্ঠু আর গুন্ঢাউলি (বেগুন ও কুমড়ো) মিশিয়ে একটা বড় মুখরোচক সব্জি বানিয়েছে। আহা, সংসারে মেয়ে না থাকলে কি হয়? বাপ বেটায় হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেয়েছে এতদিন। এখন নিজেকেই চাপড় মেরে চাপাটি বানিয়ে খেতে হচ্ছে। সব্জি, দাল কে বানায়। ভেড় বক্রির দুধে চুবিয়েই খাচ্ছে।

খাওয়ার শেষে অম্রু বুড়োর সামনে অনেক তারিফ কল্লল মেয়েটির রান্নার।

বুড়ো বলল, ঘুঙরী আমার খোঁড়া হলে কি হয়, ঐ ত আমাকে পাহাড় পর্বত, নদী নালা চালিয়ে নিয়ে চলেছে।

অম্রু দেখল মেয়েটি ভারি সুন্দর। হাসির কথা উঠলে হাসে, তবে সে হাসিতে শেষবেলার করুণ আলো মাখানো থাকে। ধান্নি চিড়ু

পাখির মত চঞ্চল। উড়ে এসে টুঁই টুঁই টিক্, টুঁই টুঁই টিক আওয়াজ তুলে চড়বড়িয়ে কথা বলে যায়। একসময় সাঁঝের আকাশের দিকে চোখ তুলে বাউড়ি থেকে হোলি গ্রাঁয়ের দিকে ফুরুৎ করে উড়ে পালায়।

চিড়্ চিড়্ শব্দে আগুন জ্বলছে। আকাশে ফুটফুটে চাঁদের আলো। ধৌলাধারের সাদা চূড়োটার মাথায় একখণ্ড মেঘ শিবের জটার মত আটকে আছে। ঐ তো আকাশে জ্বলজ্বল করছেকিরগিটি (সপ্তর্ষি)। সাতটি তারা সাতটি ঋষি। ধ্যান করছেন আকাশে বসে। হরিচন্দ্ কাণ্ডায় ঘাসের জমিতে চিৎ হয়ে শুয়ে অমৃরুকে তারা চেনাত। বলত, তারা হল দেওতাদের আঁখ।

ঘুঙরী হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে বসে আছে। আগুন নিভু নিভু হয়ে এলে পাশে রাখা কাঠের টুকরো ফেলে দিচ্ছে। বুড়ো নারেলি হাতে নিয়ে পাট্টুখানা গায়ে জড়িয়ে ভুড়ুক ভুড়ুক টানছে। একসময় হুঁকো টানা থামিয়ে অমৃরুর দিকে চেয়ে ছড়া কাটল—

গদ্দী চরদা ভেদন
গদ্দান দিন্দি ধূপ,
গদ্দী জো দিন্দা ভেদন
গদ্দান জো দিন্দা রূপ।

গদ্দী ভেড়া চরায় তাই শিব দিলেন তাদের একপাল ভেড়া। আর গদ্দান জ্বালায় শিবের উদ্দেশ্যে ধূপ তাই শিব দিলেন তাদের রূপ।

এই ছড়াটি জানা নেই অমৃরুর। কত ছড়া, কত কাহিনী, কত গান ছড়িয়ে আছে গদ্দীদের ভেতর। পথ চলতে এমনি ছড়া তারা ছড়িয়ে ছড়িয়ে যায়। অমৃরু কাংড়ায় তার মামার বাড়ীতে যে গান শিখেছে, যে ছড়া শুনেছে, চম্বায় তার অনেক কিছুই নেই। আবার নতুন অনেক কিছুই আছে চম্বায়, যা নেই কাংড়ায়। যে মেয়ের বাপের বাড়ী কাংড়ায়, শ্বশুরবাড়ী চম্বা থেকে ধৌলাধারকে বলছে, হে পর্বতরাজ দয়া করে একটিবার তোমার মাথাটি নীচু কর আমি আমার বাপের

বাড়ীখানা এক পলকে দেখে নি।

রাত বাড়ছে। শীতের দাপটও বাড়ছে। চাঁদ আকাশের সীমাহীন নীল জলে সমানে রূপোর তৈরী নৌকোখানা বেয়ে চলেছে।

অম্রু তার চোলের ভেতর থেকে বাঁশুরীখানা বের করে ফুঁ দিলে। মেয়েটি একবার তাকিয়ে নড়েচড়ে বসল। বুড়ো আপাদমস্তক পাট্টু চাপিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

অনেকক্ষণ আপন মনে বাশুরী বাজাল অম্রু। ধান্নির কথা মনে করে খুশীর সুর সাধল। আবার দুঃখী ঘুঙরীর কথা ভেবে বাঁশুরীতে কান্না ঝরাল। তার বাঁশুরী শুনে ঘুঙরীর মনে হল, সে পাহাড়ী নালা, কুহলের খলখল খুশীতে ছুটে পালানোর শব্দ শুনতে পাচ্ছে। আবার তার মনে হল, শোয়ানের (শ্রাবণ) সারা আকাশ অঝোরে কাঁদছে তার সঙ্গে সঙ্গে।

জুস্মুসার (ঊষা) হাল্কা নীলাভ একটা আলো ফুটে উঠেছে পুব দিকের পাহাড়টার মাথায়। দক্ষিণে ধৌলাধার তখনও ধূসর। অম্রু গাড়্রুর ঢাকা সরিয়ে মুখখানা বের করল। বুড়ো কখন জেগে উঠে নারেলি টানতে লেগে গেছে। ওদিকে ঘুঙরী আগুন ধরিয়ে কি যেন তৈরী করছে।

অম্রুকে জেগে উঠতে দেখে বুড়ো হাত থেকে হুঁকোটা নামিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল।

বড্ড হিত পড়েছে।

অম্রু বলল, হাঁ জী, এখন তো হিত পড়ারই কথা। আর তা ছাড়া অনেক ওপরে আমরা উঠে এসেছি। জোতের কাছে শ্যার ঋতুর শেষ দিকে হিত তো হবেই। তিন চার রোজ বাদ হাইউন্দ্ শুরু হবে।

বুড়ো বলল, হাঁ ঠিক, হিত ঋতুটা পড়বার আগেই নীচের পাহাড়ে নেমে যেতে হবে।

ধরমশালায় হাইউন্দ্টা কাটাবেন, না আরও নীচে নেমে যাবেন?

ওখানেই একটা ডেরা আছে আমার, তার সঙ্গে একটা ওরি (ভেড়-বক্‌রির আস্তানা)। হাইউন্দে ঐ ওরিতেই রেখে দি ভেড় বক্‌রিগুলো। মেয়েটাও একটু জিরোয়।

ধরমশালার কোথায় বাসা?

বানোই খাদের ধারে। সেপাই চৌকির ডাইনে।

অম্‌রু বলল, অবাক কাণ্ড! ওখানেই তো আমার মামার বাড়ী, চৌকির বাঁয়ে।

বুড়ো ঝেড়ে ঝুড়ে বসে বলল, কি নাম মামার?

পারষোত্তম।

আরে পারষোত্তমজীর ভাগনে তুমি? উনি তল্লাটের জমিনদার আছেন। আমাদের লম্বরদার।

—হাঁ জি, উনি টিকার মুখিয়া আছেন!

বুড়ো হাঁকডাক জুড়ে দিলে, ঘুঙরী, ও বেটি, এ লেড়কা লম্বরদার পারষোত্তমজীর ভাগ্‌নে আছে।

ঘুঙরী একবার বাপের দিকে তাকিয়ে আবার খানা পাকাবার কাজে মন দিলে।

বুড়ো আবেগের সঙ্গে বলল, আমার জাতের একজন মস্ত বড় আদমী। এত বড় আদমী তবু দেখা হলেই খোঁজখবর নেয়।

ভোরেই জোৎ পেরিয়ে ওপারে যাবার জন্যে উঠে পড়ল অম্‌রু। বুড়ো বলল, সে কি হয়, যা হোক্ রুটি খেয়ে যেতে হবে। রাত থেকে ঘুঙরী রেঁধেছে।

অম্‌রু বলল, বেশ, দিন, বেঁধে নিয়ে যাই। এখন ক্ষিদে নেই। রাতে খুব বেশী খাওয়া হয়ে গেছে।

ঘুঙরী নিঃশব্দে রুটি আর সব্‌জি গোছগাছ করে ভরে দিলে অম্‌রুর থলেতে।

অম্‌রু যাবার সময় এক কাণ্ড করে বসল। সে তার দামী গরম

কম্বলখানা বুড়োর গায়ে চাপিয়ে দিয়ে তার ছেঁড়া পাট্টুখানা নিজের কাঁধে তুলে নিল। বুড়ো হাঁ হাঁ করে উঠল, আরে কর কি, কর কি!

কে শোনে কার কথা। অম্রুরও তো কৃতজ্ঞতা বলে একটা জিনিস আছে। রাতে আশ্রয় দিয়েছে, কত যত্ন করে খাইয়েছে, আবার খাবার বেঁধেও দিলে, এরপর কিছু একটা না দিলে কি চলে।

অম্রু বুড়ো মানুষটির কাছে আশীর্বাদ চেয়ে মাথা নোয়াল। অমনি বুড়ো অম্রুর পিঠে চাপড় মেরে বলল, দাই জুগুতি রহ্না (জয় হোক) বেটা। বেঁচে থাক বাবা।

অম্রুর চলতে চলতে মনে হল, সে আজ এমন একটি মানুষের ছোঁয়া পেল, যে চলার তাগিদে বার্ধক্যকে অস্বীকার করতে পারে। আশ্চর্য এক প্রেরণায় মনটা তার ভরে উঠল।

সামনের পাহাড়ের বাঁক পেরুলেই গজ জোৎ। অম্রু জোতের দেওতাকে মনে মনে স্মরণ করে পথ চলছিল, হঠাৎ পেছন থেকে একটা আওয়াজ শুনে চমকে ফিরে তাকাল। এ কি! ঘুঙরী একটা টোহলের (পাথরের স্তূপ) ওপর উঠে দাঁড়িয়ে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মেয়েটা জাদু জানে নাকি! কি করে এতখানি উঁচুতে উঠল!

অম্রু লাফিয়ে উঠল টোহলের ওপর। ঘুঙরী বেশী কোন কথা না বলে শুধু বলল, এই সামান্য জিনিসটা আপনি নিলে বাবা খুশী হবেন।

অম্রু দেখল, সোনার একজোড়া নান্তি। গদ্দী পুরুষরা উৎসবের সময় এই রিং কানে পরে।

না না, এ আমি কিছুতেই নিতে পারব না। এ তো সোনার, অনেক দামী জিনিস।

বাবা তো আপনার দেওয়া গাড়্রু নিয়েছেন।

অম্রু বলল, একখানা গাড়্রু আর নান্তি এক হল ?

—উপহারের কি দাম কষে হিসেব হয়। তা ছাড়া বাবা এখন আর উৎসবে নান্তি পরেন না।

এই দামী জিনিসটা হাত পেতে নেওয়ার ব্যাপারে অম্রু ইতস্তত করছে দেখে ঘুঙরী বলল, বেশ, আপত্তি থাকলে নেবেন না। তবে আপনি দাঁড়ান, আপনার গাড়্রুখানা বাবার কাছ থেকে এনে দিচ্ছি।

মেয়েটিকে যতখানি দুঃখী দুঃখী ভেবেছিল অম্রু এ মেয়ে কিন্তু আদপেই তা নয়। আত্মসম্মান বজায় রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে জানে।

অম্রু হেসে দু হাত পেতে বলল, দিন, ওঁর নান্তি কানে থাকলে কোনদিনই পথ চলতে ক্লান্তি আসবে না।

ঘুঙরীর মুখখানা এতক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে নান্তি জোড়া অম্রুর হাতে দিয়ে বলল, আপনার দেরী করিয়ে দিলাম, কিছু মনে করবেন না।

অম্রু বলল, আপনার পিতাজীর সঙ্গে থেকে কাংড়া যেতে পারলে হয়ত তিন চার দিন বেশী সময় লাগত কিন্তু জানতে পারতাম অনেক কিছু। জরুরী কাজ হাতে নিয়ে যাচ্ছি বলে ছুটে চলে যেতে হচ্ছে।

ঘুঙরী মুখে ম্লান একটুকরো হাসি টেনে বলল, পথ চলতে এমনি আবার কোনদিন দেখা হয়ে যেতে পারে।

অম্রু বলল, তাই যেন হয়।

কথা ক'টি বলে সে ঘুঙরীকে নামতে সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়াল। ঘুঙরী একটুখানি হেসে বলল, আপনি আসুন। আমি একাই উঠেছি, একাই নামতে পারব।

অম্রু এই আত্মনির্ভরশীল মেয়েটিকে মনে মনে তারিফ করতে করতে টোহল থেকে লাফ দিয়ে নেমে জোৎ লক্ষ্য করে পা চালাল।

এক সন্ধ্যায় মামার বাড়ী এসে পৌঁছল অম্রু। মামী অনেক আগেই গত হয়েছে। পুরোনো চাকর তুম্সারাম ছুটে এল অম্রুকে দেখে। বুড়ো হয়ে গেছে তুম্সা। এখন সারা বাড়ীর ভার তার ওপর

দিয়ে পারষোত্তম ঘুরে বেড়ায় মন্দিরে মন্দিরে। স্ত্রী মারা যাবার পর সংসারের টান শিথিল হয়ে গেছে। ছেলেপুলে নেঁই। ভাগ্নেটাও কাছে রইল না। আর কার জন্যে হাঁকডাক, কার জন্যে ক্ষেতখামার।

তুম্সারাম অনেক খাতির করে ঘরে বসাল অম্রুকে। তুম্সার কাছেই শুনল, পারষোত্তম কাংড়ায় বজ্রেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গেছে। কি আর করা যায়, চার পাঁচ দিন বসে রইল মামার বাড়ী। কখন আসে, কখন আসে, এই ভরসায় চেয়ে রইল পথের দিকে।

এক রাতে স্বপ্নে হাজির হল ধান্নি। বাউড়ির ধারে বসে সে আপন মনে গান করছে। প্রি গাছের গোল গোল পাতার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে গান শুনছে অম্রু। একটা ভারী তুঃখের চেনা গান বাজছে তার গলায়। মনের ব্যথা ঝরিয়ে যাচ্ছে বাউড়ির জলে।

আসা ওয়ারে ওয়ারে
তোসাঁ পারে পারে
তেরি চলন্দি চাল বিছানি,
সজ্জন মিলন লাগে
গুটকে যাফিয়াঁ পাইয়াঁ,
খিণ্ডে খিণ্ডে সজ্জন
খিণ্ডন লাগে,
জিয়াঁ তলোয়ারি দে
ফাট্ সেইয়োঁ।

হে আমার প্রিয়, তোমার আমার মাঝখানে আজ তুস্তর বাধা। মনে হচ্ছে বুকের মাঝে কেউ যেন একখানা তীক্ষ্ণ তালোয়ার গেঁথে দিয়েছে।

ঘুম ভেঙে যেতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল তার। আজ সে মামার খোঁজে বজ্রেশ্বরী মন্দিরের দিকে যাবে।

কাংড়ায় বজ্রেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে পারষোত্তমের সঙ্গে দেখা হল না অম্রুর কিন্তু অভাবিত একটি ঘটনা ঘটে গেল।

রাতে একটু আশ্রয়ের জন্য মন্দিরের পুরোহিতকে বলেছিল অম্রু। প্রধান পুরোহিত তার ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে মন্দির সংলগ্ন একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। রাতে দেবীর প্রসাদ পাবার পর তার জন্যে নির্দিষ্ট ঘরখানিতে গিয়ে দেখে একটু দূরে আর একটি শয্যা পাতা। ঐ শয্যার ওপর বসে একটি মানুষ ধ্যান করছে। চোখ দুটি আধবোজা। অম্রু যে ঘরে ঢুকল, সেজন্যে তার ভেতর কোনরকম চাঞ্চল্য দেখা গেল না। অম্রু নিজের বিছানায় বসে লোকটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সামনে একটা প্রদীপ জ্বলছে। ঘরের অন্ধকার পুরোপুরি দূর করতে পারেনি সেই ক্ষুদ্র দীপের শিখা। কিন্তু ঐ স্বল্প আলোতেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ধ্যানরত মানুষটির মুখ। চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছরের বেশী হবে না মানুষটির বয়স। যেমন রঙ তেমনি গড়ন তার। আজ দশ বছর ধরে অম্রু এই আকৃতির একটি মানুষের কথা শুনে আসছে। যদিও বয়সে বদলে গেছে চেহারা। তবু বর্ণনার সেই আদলটা মুছে যায়নি।

মানুষটি এবার তাকাল অম্রুর দিকে। আশ্চর্য! বাঁ দিকের গালে বহু শোনা সেই বড় কালো জড়ুলটা জ্বল জ্বল করছে।

মানুষটিই প্রথম প্রশ্ন করল অম্রুকে, কোথা থেকে আসা হয়েছে?

এখন এসেছি ধরমশালা থেকে। তার আগে ছিলাম উলাংসায়।

ঐ উলাংসাতেই তোমার বাসা?

ইচ্ছে আছে, ওখানেই ডেরা বাঁধি। কিন্তু আমার আসল আস্তানা সরল উপত্যকায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল মানুষটি। এক-সময় স্মৃতির গভীর থেকে কথাগুলো উচ্চারণ করে বলল, সে প্রায় পনের বছর আগেকার কথা আমি সরল উপত্যকায় একটি রাত কাটিয়েছিলাম আমার এক দোস্তের ডেরায়। সে তখন তার বছর পাঁচেকের এক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে থাকত।

অম্রু বলল, ছেলেটির মা ছিল না, তাই না?

অবাক হয়ে মানুষটি প্রশ্ন করল, ঠিক, কিন্তু তুমি জানলে কি করে ?

অমরু দারুণ উত্তেজিত। একটা বিরাট রহস্যের সমাধান তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। সে আবার প্রশ্ন করল, দোস্তের ডেরায় এক রাত কাটিয়ে পরের দিনই কাংড়ার দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিল মানুষটি ?

তুমি কি সরলের বাসিন্দা হরিচন্দ্‌কে চেন ? তার কাছে আমার সম্বন্ধে কিছু শুনেছ ?

এতক্ষণে অমরু রুদ্ধ আবেগ মুক্ত করে দিয়ে বলল, আমি হরিচন্দ্‌জীর পাঁচ বরষের সেই মা-হারা লেড়্‌কা। অমরু আমার নাম।

লোকটি নিজের বিছানা ছেড়ে এসে প্রায় জড়িয়ে ধরল অমরুকে। আরে বেটা, তুমি হরিচন্দের লেড়্‌কা। কেমন আছে আমার দোস্ত ?

তিনি আর জিন্দা নেই। কিন্তু আর একজন আজও জিন্দা আছেন চাচাজী। তিনি বেঁচেও মরে আছেন।

কে বেটা ? কার কথা বলছিস ?

আপনার মা।

প্রায় চীৎকার করে উঠল লোকটি, আমার মা! তাঁর তো বহুৎ বরষ আগে গতি হয়ে গেছে।

অমরু গলার স্বর উঁচিয়ে বলল, ঝুটা বাত, আমি ফি বরষ বুড়িমার সঙ্গে দেখা করে আসি। আঁখ থেকে আঁসু গিরছে। বিলকুল অন্ধ হয়ে গেছে। কোঠির সামনে খাড়া হয়ে থাকে আর বাট দিয়ে চলনে-ওয়ালার পায়ের আওয়াজ পেলে হাঁক দিয়ে ওঠে, কে ? ভগৎ ? এলি বাপ ?

অমরুকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না ভগতরামের। আমার মা জিন্দা আছে আর আমি এখানে রসুইখানার কাম করছি।

অমৃরু এবার প্রশ্ন করল, কি করে জানলেন চাচা যে আপনার মা মারা গেছেন ?

ভগতরাম এবার শুরু করল তার কাহিনী। কি করে সে জড়িয়ে পড়ল একটা মস্ত বড় ভুলের ফাঁদে।

জ্বালামুখী এসেছিল প্রায় পনের বরষ আগে। মন্দিরের ভেতর বেদীর মুখ থেকে পাথর ফুঁড়ে আগ বেরুতে দেখে সে যখন অভিভূত, তখন এক জটাধারী সাধু তার পাশে এসে দাঁড়াল। সে সাধুর দিকে ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল, সাধু তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। মনে হল, সাধুর চোখেও আগ জ্বলছে। কিন্তু মুখে অদ্ভুত এক হাসি। আও বেটা, বলেই সাধু চলতে লাগল। আর ভগতরাম পহালের পিছু বাধ্য ভেড়ের মত চলতে লাগল সাধুর পিছে পিছে। বেশ কয়েকদিন সাধুর চেলাগিরি করবার পর সাধু ওকে এক সন্ধ্যায় এনে হাজির করল এই বজ্রেশ্বরী মন্দিরে।

ভগতরামকে মন্দিরের সামনে মস্ত বড় পেড়ের তলায় বসিয়ে রেখে সাধু ঢুকল মন্দিরে। একসময় মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে ভগতরামের চোখে চোখ রেখে সাধু কি যেন দেখে নিল। তারপর হঠাৎ একটা দুঃসংবাদ জানিয়ে দিল, ভগতরামের মা গত হয়েছে। তার চোখের ওপরে নাকি সে ছবি সাধুজী দেখতে পাচ্ছে।

ভগতরাম কেঁদে আকুল হতেই সাধু তাকে প্রবোধ দিয়ে বজ্রেশ্বরী মায়ের সেবক হয়ে থাকার জন্যে আদেশ করল। শেষে তার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সেবাইতের জিম্মায় দিয়ে দিলে।

মায়ের মৃত্যুর পর দেশে ফেরার কোন ইচ্ছাই রইল না ভগতরামের।

সব শুনে অমৃরু বলল, সব ভাঁওতা চাচাজী, মামার নোকর হুম্‌সারাম বলে, নীচু জায়গার আদমীর দিল আচ্ছা নেই, স্রেফ ধান্দাবাজ। চল চাচাজী, আমি তোমাকে পাঞ্জী নিয়ে যাই।

অমৃরু ভুলে গেল তার সাদির কথা। এখন বুড়ি মা ছেনছেল্লার

কাছে ভগতরামকে পৌঁছে দিতে পারলেই যেন তার জীবন ধন্য হয়ে যায়।

ভড়্কার আলো ফুটতে না ফুটতেই কাউকে কোন কিছু না বলে অম্রু আর ভগতরাম বেরিয়ে পড়ল। দ্রুত পায়ে ওরা চম্বা উপত্যকার পথ ধরল। চলতে চলতে অম্রুর মনে হল, তার হারানো মাকেই যেন সে ফিরে পেতে চলেছে।

কাতি মাসে দুর্গম হয়ে উঠেছে জোৎ। হেণ্ট্বা তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। চারদিকে সাদা চাদর বিছিয়ে শীতের রাজাকে অভ্যর্থনার আয়োজন চলেছে। দুটি অভিযাত্রী কয়েকদিন হিংস্র প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এক সন্ধ্যায় এসে পৌঁছল কিলাড়ে। ছেনছেল্লা খবরটা পেয়ে বুক ফাটিয়ে মনের ভেতর জমে থাকা কান্নাগুলো বের করে দিলে। তারপর সে আওয়াজ শুনে হাতড়াতে হাতড়াতে গিয়ে ধরল অম্রুকে। বুকে তার মাথাটা চেপে ধরে বলল, মা'র বুকে, তার লেড়কাকে ফিরিয়ে দিলি বেটা, আমি আশীর্বাদ করছি, তুই কোন কাজে হারবি না। জীবন ভোর তোর শির উচা থাকবে আশমানের মত।

প্রচণ্ড শীতে দীর্ঘ চার পাঁচ মাস কিলাড়ে কাটিয়ে অম্রু তউন্দি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটল উলাংসার দিকে। এখন আর কাংড়ায় মামার বাড়ী গিয়ে অর্থ সংগ্রহের চিন্তা নেই। সব শুনে বুড়ি ছেনছেল্লাই জোর করে তাকে তার সঞ্চিত বেশ কিছু টাকা দিয়ে দিয়েছে। বলেছে, তুই আমার বড় লেড়কার বেটা! তার ভাগ তোকে দিতে হবে না?

ভগৎ এতে ভারী খুশী। পই পই করে সে অম্রুকে বলে দিল, পাঙ্গীতে যেন সে নতুন বউকে নিয়ে আসে।

অম্রু বলল, আলবৎ আসব, তবে কথা দাও চাচা, তুমি আর সাচ্ জোৎ পেরিয়ে ওপারে যাবে না?

ভগতরাম হেসে মাথা দুলিয়ে জানাল, সে আর মাকে ফেলে কোথাও নড়বে না।

সাচ্ পেরিয়ে যাবার আগে তুনেইতে সেই বিশেষ নালাটির সামনে হাঁটু গেড়ে বসল অম্রু। কিছু খাবার সেই খরস্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে চোখ বুজে বসে রইল কতক্ষণ। এমনি করেই তো প্রতিবার সে বসে থাকে মায়ের কথা শুনবে বলে।

অম্রু ঠিক শুনতে পেল মায়ের গলার স্বর! মা তাকে বলছে, দুখ্ গায়ে মাখবি না বেটা। সব দুখ্ পায়ে গুঁড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাবি।

॥ তিন ॥

পাঁচ মাস পরে উলাংসায় সেই বাউড়ির ধারে প্রি গাছের তলায় অম্রুর অধীর প্রতীক্ষা। হাতে বাঁশুরী কিন্তু ফুঁ দেবার মত বাতাসটুকুও বুকে নেই তার। বিশাল বুকখানা অজানা আশঙ্কায় ধুকপুক করছে। সেই ভারধূপ (মধ্যাহ্ন) থেকে বসে আছে সে। যদি ধান্নি সময় পরিবর্তন করে জল নিয়ে আগেভাগে চলে যায়। নীচে বাউড়ির জল বয়ে চলেছে। অবিকল পাঁচ মাস আগে যেমন বয়ে যেত। বাউড়ির ওপারের টিলায় একটা চিঁউ গাছ দাঁড়িয়ে। ফাগুনে আগুন জ্বেলেছে ডালে ডালে। গাছের দিকে চেয়ে চেয়ে ধান্নির কথা ভেবে অম্রুর মনটাও পুড়ছে।

ওপারের পাহাড়ে সূর্য নামছে। ধান্নি কই! উদ্‌ভ্রান্ত অম্রু উঠে দাঁড়িয়ে হোলি গ্রাঁয়ের পথের দিকে পলকহীন চেয়ে রইল।

দেহারা ডুবে গেল পাহাড়ের আড়ালে। বুকের খানিকটা রক্ত ঝরিয়ে দিয়ে গেল পশ্চিম আকাশের গায়ে। অম্রু আর দাঁড়াল না। সে টিলার ওপর থেকে নেমে দৌড়ে চলল হোলি গ্রাঁয়ের দিকে।

বেশ সমৃদ্ধ আর সম্পন্ন গ্রাঁ হোলি। ক্যায়ল আর ক্ল্যা গাছের সারির ভেতর দু'তিনতলা বারান্দাওলা কাঠের বাড়ী। সূর্যের আলো পায় অথচ ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা না লাগে তেমনি হিসেব করে বাড়ী-

গুলো তৈরী। প্রায় বাড়ীর মুখই রাস্তার বিপরীত দিকে। মেয়েদের আব্রু রাখার ব্যবস্থা।

শুক্‌নো কাঠের বোঝা পিঠে বেঁধে একটি মেয়ে পথ চলতে চলতে গান গাইছিল। বসন্ত্‌ ঋতুর গান। কান পাতল অম্রু। সে জানে, এ সময় মেয়েরা বাপের বাড়ী যাবার জন্য আকুল হয়ে পড়ে। ভাই কখন তাদের আনতে আসবে সেজন্যে বার বার তাকাতে থাকে পথের দিকে।

বসন্ত্‌ আয়া বসোয়া আয়া

মেরে ভাইয়ে জো সাদা ভেজে।

অম্রু পা চালিয়ে চড়াই ভেঙে উঠে মুখোমুখি হল মেয়েটির।

আচ্ছা, বহিনজী তুমি কি হোলি গ্রাঁয়ের বউ?

মেয়েটি হেসে মাথা নেড়ে জানাল, সে এই গ্রাঁয়েরই বউ বটে।

একটা কথা বলবে বহিনজী?

বল।

তুমি ধান্‌নিকে চেন?

চিনব না কেন, ও তো তিন রোজ এসেছে বাপের বাড়ি।

অম্রুর সারা শরীরটা হিম হয়ে গেল! ঝিম্‌ ঝিম্‌ করতে লাগল মাথাটা। বাপের বাড়ী এসেছে! তবে কি ধান্‌নি আর তার নেই! অম্রু মরিয়া হয়ে শেষবারের মত প্রশ্ন করে, ও কোথায় গিয়েছিল?

বউটি হেসে ফেলল, ধান্‌নি তোমার চেনা, তবু তুমি বলছ সে কোথায় গিয়েছিল? এই তো লাল গ্রাঁয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে আসছে।

মেয়েটিকে আর কোন প্রশ্ন করল না অম্রু। অভিবাদন জানিয়ে যে পথ ধরে এসেছিল সেই পথেই ফিরে চলল।

একটা ঘোরের ভেতর দিয়ে সে এসে পৌঁছল বাউড়ির পাশে। এই মুহূর্তে টিলার ওপর উঠে ক্যায়লের বন পেরিয়ে উলাংসায় নেমে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে বাউড়ির ধারে তারায়ভরা আকাশের

দিকে মুখ করে একটা মসৃণ পাথরের ওপর শুয়ে পড়ল। কিন্তু স্থির হয়ে শুয়ে থাকতে পারল না সে। কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে উঠে বসল। উদ্‌ভ্রান্তের মত আবছা অন্ধকারে ঘুরে বেড়াল এদিক ওদিক। একসময় বাউড়ির হিম শীতল জলে ভিজিয়ে নিল মাথাটা।

রাত গভীর হল। চাঁদ উঠল আকাশে। একখণ্ড পাথরের ওপর বসে থাকতে থাকতে অম্‌রুর মনে হল, সে যেন এতক্ষণ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠল এইমাত্র। অম্‌রু উঠে দাঁড়াল। চাঁদের আলোয় পথ চিনে উঠল টিলার ওপর। বন পেরিয়ে উলাংসার দিকে রওনা হল। রাতের ইরাবতী বয়ে চলেছে। চাঁদের আলো পড়ে এক এক জায়গায় কুচি কুচি ভাঙা কাচের মত ঝিলিক দিচ্ছে। একটি জায়গা পেরিয়ে আসার সময় পা পড়ল ঘাসের জমিনে। পায়ের চাপে কত ঘাস আহত হল। অন্য দিন হলে অম্‌রু এসব নিয়ে মাথাই ঘামাত না। আজ সে জমিনের প্রান্তে পৌঁছে উবু হয়ে বসে ঘাসের ওপর হাত বোলাতে লাগল। এ তো ঘাস নয়। ভারী মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। ঘাসের মত ছ্যামছুল সবুজ রঙের ফুল ফুটিয়েছে ফাগুনে। পায়ে পিষ্ট হয়েও আঘাতকারীর কাছে তার গন্ধটুকু পাঠিয়ে দিচ্ছে।

উঠে দাঁড়াল অম্‌রু। মুহূর্তে তার মনের রূপান্তর ঘটল। একটু আগে তার মনে হয়েছিল, ভালবাসার ক্ষত নিরাময় করতে পারে এমন দাওয়াই এ দুনিয়ায় নেই, কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হল, যার কাছ থেকে সে আঘাত পেয়েছে তাকে মনে মনে ক্ষমা করা, তার জন্যে শিবজীর কাছে প্রার্থনা করাই দুঃখ ভোলার একমাত্র পথ। ছোট ছোট ছ্যামছুল যা পারে সে কেন তা পারবে না। চোখ বুজে ধান্‌নির জন্য সে প্রার্থনা জানাল, ধান্‌নি তার নতুন সংসারে সুখী হোক। দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে সে দায়িত্ব ধান্‌নির নয়, তারই। দীর্ঘ পাঁচ মাস সে উলাংসা থেকে উধাও। নিশ্চয় ধান্‌নি বহু দিন বাউড়ির ধারে এসে তার জন্য প্রতীক্ষা করেছে। তাকে না দেখতে পেয়ে বাউড়ির

জলে মিশিয়েছে তার চোখের জল। তারপর আহত ধানুনি একটা অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে।

এতগুলো কথা মনে মনে আউড়ে অমরু কিছুটা সুস্থ বোধ করল। সে এখন ধীরে ধীরে চলল তার আস্তানার দিকে। তবে চলতি পথে সে স্থির করে নিল, উলাংসাতে তার আর থাকা হবে না। সরলেই সে ফিরে যাবে। যাবার আগে উলাংসার জায়গা জমির একটা কিছু বিলি ব্যবস্থা করে যেতে হবে।

কয়েক দিনের ভেতর এক দোস্তের ওপর তার সামান্য জমিটুকুর তদারকির ভার দিয়ে অমরু আবার পথে নামল। সে এখন যাবে সরল উপত্যকায়। সেখান থেকে কোন বড় মানুষ গদ্দীর ভেড় বকৃরির বাওয়ালের কাজ নিয়ে পাঙ্গী যাবে সে। কাজ না পেলেও তাকে যেতে হবে। সাদি যখন তার হল না তখন ছেনছেল্লার টাকা নিজের কাছে রাখার কোন মানেই হয় না। ফিরিয়ে দিয়ে আসবে সে ভগতরামের মায়ের টাকা। বলে আসবে, সাদি করলে টাকাটা ফের চেয়ে নেবে।

ক্লান্ত পায়ে অপ্রসন্ন মনে পথ চলতে চলতে এক সময় থমকে দাঁড়াল অমরু। তুন্দা গ্রাম না? এখানেই তো বুড়ো বাপের সঙ্গে ঘুঙরী থাকত। কাংড়াতেও ওদের সামান্য একটুকরো ক্ষেতি আর কাঠের বাড়ী আছে। চেত্ মাসে এখানেই তো ভেড় বকৃরি নিয়ে ওদের থাকার কথা। অমরু ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে লাগল গ্রাঁয়ের বসত এলাকার দিকে।

একটি ঘিরথ চাষী মাটির আল দেওয়া জমির সীমানা বা বীরের ওপর বসে নারেলি টানছে আর কানক বা গমের ক্ষেত পর্যবেক্ষণ করছে। সবে সোনা রঙ ধরেছে কানকের শিষে। মাঝে মাঝে লোকটি নারেলি টানতে ভুলে যাচ্ছিল।

অমরু অনেকক্ষণ লোকটিকে দেখল। এক সময় তাকে একটু অন্যমনস্ক হতে দেখে কাছে গিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

আচ্ছা, এখানে এক বুড়ো গদ্দী থাকে যে তার মেয়েকে নিয়ে

ভেড় চরাতে যায় ; জান তুমি সেই বুড়োকে ?

জানব না কেন। আমরা ঘিরথ চাষীরা থাকি পাহাড়ের বাঁ দিকের শিরায়। আর হুই হোথায় থাকে গদ্দীরা।

বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে অমরু একটি বুড়িকে পান্‌চাক্‌কিতে মক্‌কি পিষতে দেখল। চাক্‌কির পাশে গিয়ে অমরু তেমনি বুড়োর খোঁজ করল।

বুড়ি চাক্‌কি থামিয়ে কয়েক লহমা অমরুর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি কি জান না ছাজুবুড়ো গত হিতে কাংড়ায় মারা গেছে।

আমি জানতাম না, বুড়িমা।

এবার বুড়ি চাক্‌কি-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাত তুলে ছাজুবুড়োর আস্তানাটা দেখিয়ে দিলে।

অমরু কেন জানি না বুড়োর জন্য মনে মনে কষ্ট অনুভব করল। কোমরে গোঁজা বজ্‌লুতে হাত চেপে দেখল বুড়োর দেওয়া সোনার নান্‌তি জোড়া তার ভেতর রয়েছে।

কাঠের ছোট্ট দোতলা ঘর। সামনের উঠোনে বসে ঘুঙরী ভেড়ার লোম আঁচড়ে কাটনা কাটার জন্য তৈরী করছিল। এ কাজটা ঘরে বসে শীতকালেই করে মেয়েরা কিন্তু ঘুঙরী এই গরমকালে অবসর পেয়ে হাতের কাজটা সেরে রাখছিল।

উঠোনের চারদিকে ব্যাঠ্‌ঠ্‌র গাছের বেড়া। এক কোণে তিন চারটে হারংগড় গাছ চওড়া পাতার ফাঁকে ফাঁকে হলুদ লাল ফুল ফুটিয়েছে। পেছন দিকে এক টুক্‌রো ক্ষেতিতে কোন চাষ দেওয়া হয় নি। বেশ কিছু ঘাস গজিয়েছে আর তাই ছিঁড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে কয়েকটা ভেড় বক্‌রি।

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অমরু স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ঘুঙরীর দিকে। আপন মনে উঠোনে হাঁটু মুড়ে বসে বসে ঘুঙরী কাজ করে চলেছে। পিঠের ওপর ঝুলে আছে মস্ত এক বিনুনী। মুখের

একটি পাশ দেখা যাচ্ছিল ঘুঙরীর। ভারী সুন্দর মুখের আদল। হেঁটে চলে না বেড়ালে কোন খুঁতই ধরার উপায় নেই মেয়েটির।

অমরু উঠোনের বেড়া ঠেলে ঘুঙরীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। চমকে মুখ তুলে তাকাল ঘুঙরী। এমন অবাক সে কোন দিনই হয় নি। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে উঠতে পারল না সে। বাঁ হাতখানা মেঝেতে চেপে আধবসা অবস্থায় মুখখানা কাৎ করে বলল, আপনি!

অমরু ম্লান হেসে বলল, তোমার গ্রাঁয়ের ওপর দিয়ে সরলে যাচ্ছিলাম, খবরটা পেয়ে তোমার সঙ্গে একবার দেখা না করে যেতে পারলাম না।

ঘুঙরী এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যখন এসেছেন কষ্ট করে তখন আর একটু কষ্ট করে ঘরের ভেতর আসুন।

ঘুঙরীর পেছনে অমরু গিয়ে ঘরে ঢুকল। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দু'জনে উঠল ওপরে। অমরু সান্ত্বনার কথা বলতে চাইছিল কিন্তু ঘুঙরী তাকে বাধা দিয়ে বলল, আগে কিছু সেবা করুন, পরে কথা হবে।

অমরু ঘরের মেঝেতে পাতা খিন্দের (ছেঁড়া কাপড়ে তৈরী কাঁথা) ওপর আরাম করে বসল আর সারা ঘর ওপর-নীচ করতে করতে ঘুঙরী অতিথি পরিচর্যার আয়োজনে ব্যস্ত রইল।

তিন দিন পরে উভয়ের পরামর্শ মত একটি লোককে পাঠান হল কাংড়ায়। অমরুর সাদির সব আয়োজনই পাকা। মামা পারষোত্তম যেন খবর পাওয়ামাত্র লোকটির সঙ্গে তুন্দা গ্রাঁয়ে চলে আসেন।

অমরু বিয়ের প্রস্তাব করলে ঘুঙরী শুধু একটি কথা বলেছিল, খোঁড়া মানুষকে সাদি করে শেষে দুঃখ পাবে না তো?

অমরু উত্তর দিয়েছিল, পা খোঁড়া হলে দুঃখ পাব না কোন দিন, কিন্তু দিলটা খোঁড়া হলে সইতে পারব না।

অমরুর কথা শুনে হাসিতে সম্মতি জানিয়েছিল ঘুঙরী।

সাত দিনের মাথায় হন্তদন্ত হয়ে মামা পারষোত্তম এসে হাজির।

ভাগ্নেকে জড়িয়ে ধরে একরাশ চোখের জল ঝরাল। তারপর হাঁক-ডাক করে জড়ো করল তুন্দা গ্রাঁয়ের রথী সম্প্রদায়কে।

বিয়ের আয়োজনের প্রধান ভারই তো মামার। বিয়ের বেদী তাকেই তো তৈরী করতে হবে। ছেলেমেয়ে সাদিতে বসবে লাল রঙের পোশাক পরে। মামাকে দিতে হবে সে পোশাক। বিয়ের আগে মামা ভোজ দেবে ভাগ্নে ভাগ্নিকে, নইলে কি আর বিয়ের আসরে বসা যায়।

রথী সম্প্রদায়ের গদ্দী, তাই বিয়ে দিতে বামুন এল এক ধাপ নীচের। যারা চাষের কাজে যোগ দেয় না, তারা হল বিশুদ্ধ বামুন আর যে বামুন চাষ আর যজমানী দু' কাজই করে তারা কিছুটা নিম্ন শ্রেণীর।

গদেরানের বাসিন্দাই গদ্দী। বামুনরা নিম্ন শ্রেণীর মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনতে পারে কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর ঘরে মেয়ের বিয়ে কদাচ দেবে না। রাজপুত, ক্ষেত্রী আর ঠাকুর সম্প্রদায়ের লোকেরা, নিজেদের বলে আসল গদ্দী। বামুনের মত তারাও পৈতে নেয় গলায়। তাদের নিজেদের ভেতর বিয়ে সাদি হয়। পাহাড়ের এক প্রান্তে, যেখানে লোকজনের যাতায়াত খুব কম সেখানেই কোঠি তৈরী হয় ওদের। ঘরের মুখ থাকে পথের বিপরীত দিকে। মেয়েরা পর্দানশীন।

এদের পরে সিপি, রথী, বাদী, লোহার। সব শেষে হোলিয়া। বাক্স, ঝুড়ি আর জুতো তৈরীর কাজ করে হোলিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা।

নিজের গোত্রে বিয়ে নেই, বিয়ে আছে স্বজাতির ভেতর। এক গ্রাঁতে সাধারণত একই সম্প্রদায়ের লোকে ভীড় করে থাকে। ভিন্ন জাতির লোক একই গ্রাঁতে থাকলে তারা থাকবে পাহাড়ের ভিন্ন শৈল শিরায় কোঠি বানিয়ে। একই পানিহার থেকে বিভিন্ন জাতির লোকেরা জল নিতে চাইবে না।

অম্রুর মুক্ত মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কেন এমন হয়।

এক আকাশের তলায়, এক পর্বতের ওপর মানুষে মানুষে এত তফাৎ কেন? ছোটবেলা ধরমশালায় মামার বাড়ীতে থাকার সময় একটা ঘটনা তার শিশু মনকে আহত করেছিল। নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে একদিন সে দেখল ওপারে ঠাকুর সম্প্রদায়ের একদল লোক একটি ঘিরথ চাষীকে ধরে বেধড়ক ঠ্যাঙাচ্ছে। পরে চাষীটি নদী পেরিয়ে এপারে এলে অমৃক তার মুখ থেকে জানতে পারল আসল ঘটনা। সে রাজপুত এলাকার সামনে দিয়ে মনের খুশীতে ঢোলকে বোল বাজাতে বাজাতে যাচ্ছিল। ওরা তাকে ঘিরে ধরে মেরেছে আর বলেছে, নীচু জাতের এত বড় আস্পর্ধা, ঠাকুরদের মহল্লার সামনে দিয়ে ঢোল পিটিয়ে যায়।

অমৃক লোকটির কাছ থেকে তার ফেঁসে যাওয়া ঢোলটা চেয়ে নিয়ে ভাল করে সারিয়ে ঐ ঠাকুর মহল্লার সামনে দিয়ে বাজাতে বাজাতে ঘিরথ চাষীটির বাড়ী গিয়ে দিয়ে এসেছিল। পারষোত্তমের ভাগ্‌নে আর ছেলেমানুষ বলে নাকি তাকে কেউ কিছু বলে নি।

আজ বিয়ের আসরে বসতে গিয়ে মামাকে ধরে পড়ল অমৃক, এ গ্রাঁয়ে তিন ঘর ঘিরথ চাষীর বাস। এ বিয়ে উপলক্ষে ওদের ডেকে খাওয়াতে চাই।

তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা উঠে চলে যাবে বেটা। এক ঠাঁই বসে খাবে না।

কিন্তু মামা, যখন কোঠি তৈরীর সময় কেওয়ার প্রথা অনুযায়ী লোক ডাকা হয় তখন তো প্রতিটি চুল্লার থেকে এক একজন করে লোক আসে সাহায্য করতে। সারাদিন কাজ করে তারা তো সাঁঝবেলা এক ঠাঁই বসে সুরা আর সঞ্জিয়ালু খায়। তখন তো তাদের জাত যায় না?

মামা আদর করে বলল, পাগলা, সারা জীবন তো বাপের সঙ্গে পহালগিরি করে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালি, সমাজের দেখলি কতটুকু? এক গ্রাঁয়ে এমনিতে একজাতের লোকই বাস করে, তাই

কেওয়ার থেকে লোক এলে সবাই এক ঠাঁই বসে মিলে মিশে খায়।

অম্রু বলল, সে না হয় মানলাম, কিন্তু বির্তনের সময় কি হয়? তখন তো পাশাপাশি দু' তিন গ্ঁায়ের নানা জাতের লোকের সঙ্গে বির্তন বন্ধু পাতান হয়। তারা তো দরকার হলে টাকা পয়সা নিয়ে বিয়ে সাদিতে সাহায্য করতে আসে। কোঠি বানানো. ক্ষেতির কাজ, সব কিছুতেই বির্তনবন্ধুর সাহায্য পাওয়া যায়। তারা কি কাজের বাড়ীতে এসে না খেয়ে চলে যায়?

তা কেন হবে, এক পঙ্‌ক্তিতে না বসলেই হল।

অম্রু রাগ করে বলল, এ ব্যাপারটাই আমার ভাল লাগে না মামা। তার চেয়ে সাদিতে ভোজ বাদ দাও।

লোকে ছি ছি করবে। সমাজে বাস করতে পারবি না।

অম্রু বলল, সাদি হয়ে গেলে ঘুঙরীকে নিয়ে চলে যাব সরলে। তুন্দা আর উলাংসার পাট তুলে দেব।

মামা পারষোত্তম অভিমানের গলায় বলল, ছোটবেলা থেকে মামার বাড়ী মানুষ হলি, এখন বুড়ো বয়সে মামাকে একটু দেখবি না? ধরমশালায় আমার এত বড় ক্ষেত খামার তোকে ছাড়া আর কাকে দিয়ে যাব বল?

মামার গলার ভেজা সুরটা যুবক অম্রুর বুকে এসে বাজল। সে বলল, ঠিক আছে মামা, ভেব না, ঘুঙরীকে আমি বিয়ের পর তোমার কাছেই রেখে দেব। ঐ খোঁড়া মানুষকে আমি আর তউন্দির চারণের সময় পাহাড় ডিঙিয়ে পাঙ্গী নিয়ে যাব না। শীতের সময় আমি গিয়ে তোমার ওখানে থাকব।

ভাগ্‌নের কথা শুনে পারষোত্তম ভারী খুশী হল। সে ধুমধাম করে ভাগ্‌নের বিয়ের জোগাড়যন্ত্রে লেগে গেল।

ঘুঙরীকে সবাই ভালবাসে। তাই খোঁড়া ঘুঙরীর এমন ভাল বিয়ে হচ্ছে জেনে গ্ঁা ভেঙে এল বিয়ের আসরে। সবাই একবাক্যে তারিফ

করল পারষোত্তমের। এমন বিয়ের বেদী সাজানোর ঘটা তুন্দা গ্রাঁয়ে এর আগে আর কখনো হয়নি।

খানাপিনার ব্যবস্থাও ছিল উঁচু জাতের ক্ষেত্রী মহাজনদের মত। বব্রু, দাল, খিচ্ড়ি, সিংখা বা মাংস—পর্যাপ্ত ব্যবস্থা।

মেয়ে পুরুষে মিলে প্রায় সারা রাত নাচ গান করল। মেয়েরা বাসরে অস্থির করে তুলল বরকে। তারা গান গেয়ে বলতে লাগল, ওহে কন্‌হা (কানু) আর লাগামছাড়া প্রেমের খেলা খেল না। এখন চারদিকে চোখ না দিয়ে একটির দিকেই নজর দাও। মন দিয়ে সংসার করতে শেখ।

ভোরবেলা ছাজুবুড়োর ক্ষেতির মাঝখানে চিঁউগাছের তলায় শুরু হল হোলি খেলা। ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে আবীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারল। ফুলে ফুলে লালে লাল চিঁউ গাছ। কোন প্রেমিক যেন মুঠো মুঠো আবীর ছুঁড়ে তার শরীর রাঙা করে দিয়ে গেছে।

হোলি খেলার শেষে যে যার ঘরে ফিরে গেল। চিঁউগাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে তাদের বিদায় জানাল বরবধূ।

এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঘুঙরী আর অমৃরু। ঘরের পেছনে ক্ষেতি, তাই সবার চোখের আড়ালে থেকে দু'জন দেখছে দু'জনকে। পারষোত্তম সাজিয়ে দিয়েছে ভাগনে বউকে সবরকম গয়না দিয়ে।

ভারী মিষ্টি মুখখানা ঘুঙরীর। সোনার চাউক্ক্ পরেছে মাথায়। রূপোর জিঞ্জিরি ঝুলছে কপালের ওপর। নাকে পরেছে সোনার বালাং। গলাতে রূপোর দদ্‌মালা। রঙীন পুঁতি আর বন থেকে কুড়িয়ে আনা রঙীন ফলের বীজের তিন-চার রকম মালায় বুকখানা জমজমাট। কোমর ঘিরে কাজকরা রূপোর গোজ্‌রো।

অবাক চোখে নতুন বউকে দেখছে অমৃরু। আধবোজা চোখ, সারা মুখে ছড়িয়ে পড়া তৃপ্তি নিয়ে স্বামীকে দেখছে ঘুঙরী। মনে হচ্ছে আজকের এই ভালোবাসা কোন দিনই ফুরোবে না তাদের জীবনে।

হঠাৎ কি হল অম্রুর। সন্ত শুকিয়ে আসা একটা ক্ষত থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করল। ঘুঙরী প্রথামত বিয়ের পর সন্ত পরেছে বালাং। নাকের সেই সোনার নাথ্‌লিতে আঙুল ছুঁইয়ে সে তাকাচ্ছিল অম্রুর দিকে। অম্রুর হঠাৎ মনে হল, ও ঘুঙরী নয় ধান্‌নি। বাউড়ির কাছে দাঁড়িয়ে নাকে আঙুল রেখে বলছে, নাকে বালাং থাকলে তবেই তো বুঝবে সাদি হয়েছে। কুমারী মেয়ে কি বালাং পরে?

পরমুহূর্তে নিজেকে ধিক্কার দিল অম্রু। ছিঃ ছিঃ, কি ভাবছে সে। ঘুঙরী আজ তার কাছে সবচেয়ে সত্য। পেছনের সব দুঃখকে আড়াল করে ঘুঙরী তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মণিমহেশের পবিত্র চূড়ার মত।

ভাবনার এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুঙরীর হাত ধরে অম্রু বলল, এ দুনিয়ায় তোমার চেয়ে প্রিয় আর জিনিস আমার কাছে কিছুই নেই

ঘুঙ্‌রী অমনি বলল, ও কথা বল না। তুমি গদ্দী, ভেড় বক্‌রি নিয়ে পথ চলাই তোমার জীবনে সবচেয়ে প্রিয় কাজ।

মানি ঘুঙরী. কিন্তু এখন তো ও ধন আমার নেই।

ও কথা কেন বলছ তুমি? আমার যে সামান্য ধন আছে সে কি তোমার নয়? আজ থেকে তুমি আমি কি আলাদা?

অম্রু আবেগে ঘুঙরীর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বলল, ওটা তোমারই ধন, কেবল গচ্ছিত থাকবে আমার কাছে। আমি তোমার বাওয়াল হয়ে বাড়িয়ে যাব তোমার ধন।

ঘুঙরীর চোখে জল। সে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ও কথা বল না। তুমি পহাল আর আমি পহালনি। এ ধন আমাদের দু'জনের। আমরা এ ধন দিনে দিনে বাড়িয়ে যাব। আমাদের ছেলেমেয়েরাও ভবিষ্যতে এ ধন বাড়িয়ে তোলবার ভার নেবে।

একটু থেমে ঘুঙরী আবার বলল, আজ আমার একটা কথা রাখবে?

বল, নিশ্চয়ই রাখব।

না শুনেই বলছ?

আজ সব কিছুই তোমাকে উজাড় করে দিতে চাই ঘুঙরী। তোমার কথা রেখে যে আনন্দ পাব তার তুলনা নেই।

ঘুঙরী একে একে সোনা রূপোর গয়না খুলে জড়ো করল। অম্রু অবাক হয়ে দেখতে লাগল ঘুঙরীর কাণ্ড।

নিজের ঘুন্‌ডিতে গয়নাগুলো বেঁধে অম্রুর হাতে তুলে দিয়ে বলল, এগুলো তোমাকে দিলাম। তুমি বেচে দিয়ে যা পাবে তাই দিয়ে ভেড় আর বক্‌রি কেন। আমাদের ধনের সংখ্যা বেড়ে যাক।

অম্‌রু প্রথমে কোন কথা বলতে পারল না। সে অবাক চোখে চেয়ে রইল ঘুঙরীর দিকে। একসময় বলল, দু'জন মানুষের সংসার একদিন বড় হয়ে ওঠে, আমাদের এই ছোট্ট ভেড় বক্‌রির দলও একদিন বড় হয়ে উঠবে। তুমি কেন তোমার সখের গয়নাগুলো বেচে দিতে চাইছ ঘুঙরী?

গদ্দীর জীবনে ভেড় বক্‌রি ছাড়া অন্য কোন শ্রেষ্ঠ ধন নেই। আমাদের দলটা তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠুক এই আমি চাই।

অম্‌রু বলল, বেশ, তোমার কথাই থাকবে, তবে আমার একটি কথা তোমাকেও রাখতে হবে।

বল?

শুধু সোনার বালাংখানা তুমি পরবে। গলায় পুঁথি আর কুঁচের মালা থাকলেই চলবে।

পরব।

চিঁউ গাছের ডালে দুটো নেল পাখি উড়ে এসে বসল। নানা রঙের পালকে চিত্রিত। দুটো ডাল থেকেই ওরা শিস্ দিতে লাগল। ওদের মিলনের লগ্ন ঋতু-বসন্ত।

অম্‌রু আর ঘুঙরী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পাখি দেখতে লাগল।

কথামত মামা পারষোত্তম বর্ষালায় ভাগ্‌নে বউকে রেখে দিল তার ধরমশালার ঘরে। ঘুঙরীর প্রথম বাচ্চা হবে। পাহাড়ের পর পাহাড়

ডিঙিয়ে খোঁড়া মেয়েটি পেটে বাচ্ছা বয়ে নিয়ে কেমন করেই বা যাবে উড়াঙ্খার। একা অমৃরুই তার ভেড় বকৃরির দল তাড়িয়ে নিয়ে চলল উড়াঙ্খারের পথে। মামার কথাটা মনে ধরল তার। তোর মাও তো একদিন তোকে পেটে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পাঙ্গী। তারপর আর নিজের আস্তানায় ফিরে আসতে পারেনি। থাক ঘুঙরী আমার কাছে।

উড়াঙ্খারের কাণ্ডায় সবুজ ঘাসের গদীতে শুয়ে যত ঘুমোয় অমৃরু তার চেয়ে জেগে স্বপ্ন দেখে বেশী। অনেক সময় মনে হয় তার পাশেই শুয়ে আছে ঘুঙরী। সে তার ঈষৎ স্ফীত উদরের ওপর কান চেপে অনাগত শিশুটির স্পন্দন শোনার চেষ্টা করে। এমনি ভাবনার ভেতর আবার কখন চোখ বুজে আসে তার ঘুমে। ভোরবেলা জেগে উঠে মন খারাপ হয়ে যায় তার।

আসার সময় ঘুঙরী তাকে বলেছিল, মন খারাপ কোর না যেন। আমি যেখানেই থাকি, তোমার কাছেই থাকব।

উড়াঙ্খারে প্রায় সারাক্ষণই হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুঙরীর সেই কথাটি ভেসে বেড়ায়। অমৃরুর কানে প্রায়ই গুনগুনিয়ে ওঠে সে কথা। অমৃরু রুবানা বাজায় রাতে। তার মনের নিঃসঙ্গতার কান্না রুবানার সুরে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। হঠাৎ বাজনা থামিয়ে সে তুষার পর্বতের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলে, বাবা কৈলাশপতি আমার ঘুঙরীকে দেখ প্রভু।

এদিকে ধরমশালায় শুরু হয়ে গেছে অঝোর বর্‌খা। তালতাল মেঘ পাহাড় পর্বত থেকে বেরিয়ে ছেয়ে ফেলছে আকাশ। চিকুর হানার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় গুড়কানা বা বাজের ডাক। সে ডাক আর যেন থামতেই চায় না। সারা উপত্যকার পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেতে খেতে সে ডাক কতক্ষণ ধরে বাজতে থাকে।

একা বাপের ছোট্ট কাঠের বাড়ীতে ঘুঙরী যেদিন কাটায় সেদিন তার কেমন যেন কান্না পায়। সে ঝার্‌রির সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল ঝরিয়ে গান ধরে—

ঘানি ঘানি ধোরি পেইও
আয়া জিন্দে
আবে বর্ষালা।

ঝর ঝর করে বর্ষার ধারা ঝরে পড়ছে। এমন দিনে তুমি আমার কাছে এস প্রিয়।

এদিকে আষাঢ়ের শেষ দিনটিতে পারষোত্তমের বাড়িতে শুরু হয়ে যায় হরিয়ালি উৎসব। দিন দশেক আগে ঘুঙরী পাঁচ ছ' রকম বীজ একটা মাটিভরা বাক্সে ছড়িয়ে রেখেছিল। প্রতিদিন তাতে জল ছিটিয়ে দিত সে। এখন অঙ্কুরিত হয়েছে সে বীজ। তার মাঝখানে বসানো হয়েছে শিব-পার্বতার মূর্তি। আজ হর-পার্বতীর বিয়ের দিন। মেয়েরা জড়ো হয়েছে ঘরের মধ্যে। তারা গানে গানে বলছে, হে হরিয়ালি, তুমি চিরদিন আমাদের সবুজ শস্যের ক্ষেত রক্ষা কর। যারা তোমার পূজো করে তাদের সব দুঃখ দূর কর দয়াময়। ক্ষেত চষার সময় ক্ষেত্র-পালকে প্রসন্ন করা হয়। মহল্লা থেকে নিয়ে আসা হয় কুমারী মেয়ে। পারষোত্তম সেই কিশোরী মেয়েটির বন্দনা করে। থালা ভরে খাবার দেওয়া হয় তাকে। সঙ্গে উপযুক্ত দক্ষিণার কড়ি।

ঘুঙরী এই বাদলের দিনে ঘরের দাওয়ায় বসে দেখল, চেলা চলেছে আগে আগে, তার পেছনে সাই বা ছাতা ফুটিয়ে চলেছে কয়েকজন। দ্রুত পায়ে চলে যাচ্ছে তারা। ওতো ছাতা নয়, ছাতার রূপ ধরে গুগা দেওতা। সাপে কাটা রোগীকে ভাল করতে ভক্তের বাড়ীতে চলেছেন তিনি।

হঠাৎ মনটা কেমন হু হু করে ওঠে ঘুঙরীর। দু'দুটো বরফের পাহাড়ের ওপারে আছে মানুষটা। উড়াদ্ধারে ঘাসের জমিনে ঘুরছে একা একা। চোখের জল মুছে ঘুঙরী প্রার্থনা জানায়, হে গুগা

বাবা, তুমি আমার মুখ রেখ। ওর যেন কোন রকম বিপদ না ঘটে প্রভু।

॥ চার ॥

কাতি (কার্তিক) মাস। পূর্ণগর্ভা ঘুঙরী এখন অম্রুর পথ চেয়ে বসে আছে। ধৌলাধার পেরিয়ে মানুষটা নিশ্চয়ই তার ভেড় বক্‌রির দল নিয়ে অনেকখানি নীচে নেমে এসেছে।

প্রতি বছরের মত এবারও নবরাত্রে পারষোত্তমের সারা ঘরের দেয়ালে গেরি মাটির প্রলেপ পড়েছে। এই বিশেষ সময়ে সবার বাড়ীরই চেহারা ফেরান হয়। বাড়ীর মেয়েরাই মাটি দিয়ে প্রলেপের কাজটা সারে। কেবল বামুন আর ক্ষেত্রী বাড়ির মেয়েরা এ কাজ করে না। ঘুঙরী কিন্তু সারাদিন ধরে দেয়াল-প্রলেপের কাজ করেছে। পারষোত্তম শুরুতেই হাঁ হাঁ করে বাধা দিতে ছুটে এসেছিল, কিন্তু ঘুঙরীকে নিরস্ত করা যায়নি। সে বলেছিল, মামাজী, কাম করলে আমি ভাল থাকি, কাম ছাড়া আমি বাঁচব না।

তা বলে এ সময়!

ঘুঙরী পারষোত্তমকে হাত নেড়ে বলেছে, আপনি এখন নোহরি (ভোরের হাল্‌কা জলযোগ) সেরে বাহার যান তো মামাজী।

পারষোত্তম আর কথা না বাড়িয়ে বাধ্য ছেলের মত মাথাটা নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে গেছে।

ক্ষেতির কাজ সেরে ফিরে আসতে দেরী হয়েছিল পারষোত্তমের। এসে ঘরের উঠোনে দাঁড়িয়ে দেয়াল থেকে আর চোখ ফেরাতে পারেনি। এ কি দেখছে সে! গেরুয়া রঙের দেয়ালের ওপর খড়ি মাটির রঙ দিয়ে সারি সারি লতাপাতা ফুল এঁকেছে ঘুঙরী। মাঝখানে শিব-পার্বতীর যুগল মূর্তি।

পারষোত্তম ডাক দেয়, কোথা গেলিরে বেটি?

মিষ্টি একটুকরো হাসি মুখে ফুটিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় ঘুঙরী।

উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে পারষোত্তম, বুক ফুলিয়ে বলুক, এ মহল্লায় কে কবে পেরেছে এমনটা আঁকতে! এত গুণ তোর বেটী?

লজ্জা পেয়ে ঘুঙরী অন্য কথা পাড়ে, বেলা কত দেখেছেন? দাতি-য়ালুর (দিবা ভোজ) সময় কখন পেরিয়ে গেছে। আপনি হাতমুখ ধুয়ে আগে খেতে আসুন মামাজী। আমার বুঝি ক্ষিদে পায়না?

ঘরে ঢুকে যায় ঘুঙরী। মনে মনে খোঁড়া মেয়েটিকে শতবার আশীর্বাদ জানায় পারষোত্তম। নাঃ, নজর আছে বটে বেটা অমরুর।

কাজের ভেতর ডুবে থাকতে জানে ঘুঙরী। পানিতে মচ্ছির মত। ওতেই ওর চলাফেরা, ওতেই ওর প্রাণ।

কদিন থেকেই ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখতে দেখতে চমকে উঠছিল ঘুঙরী। সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে পারষোত্তমের নজর এড়িয়ে ও চলে যাচ্ছিল ওরির (ভেড়া, ছাগলের আস্তানা) দিকে। ওখান থেকে চোখ রাখছিল গদ্দী পহালদের নেমে আসা পথের ওপর। এক একটা ভেড়ার দল নেমে আসছে, ঠিক যেন সাদা গারেন্ট্ (হিমবাহ) পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে গড়িয়ে নেমে আসছে।

তার মানুষটা কই! নিজের মানুষটার জন্যেই তো একরাশ ভাবনা নিয়ে বসে থাকা। এত প্রতীক্ষা, পারষোত্তমের চোখ এড়িয়ে এত লুকোচুরি খেলার পর ঘুঙরী যখন অমরুকে নেমে আসতে দেখল তখন এক দৌড়ে সে ঢুকে পড়ল কোঠির ভেতর। সেই যে সিঁধোলো, পারষোত্তম গলা ফাটিয়ে ডেকে ডেকে তবে তাকে রসুই ঘর থেকে বের করতে পারল।

যেন কিছুই জানেনা ঘুঙরী। হাতে একখানা ডোই (খুন্তি)। এইমাত্র যেন কাড়চিতে (কড়ায়) ডোই নাড়তে নাড়তে চলে এসেছে।

ডাকছেন মামাজী? কপট জিজ্ঞাসা চোখে মুখে মাখান।

পারষোত্তমের চোখে ধুলো দেওয়া এত সোজা? সে বেশ কদিন

ধরে আড়চোখে লক্ষ্য করেছে ঘুঙরীর ক্রিয়াকলাপ। ভারী মজা লেগেছে তার। ঘুঙরী যখন তাকে আড়াল করে ও'রির দিকে যাবার চেষ্টা করে তখন পারষোত্তমের হঠাৎ কাজ পড়ে যায়। সে কাজের অছিলায় বাইরে বেরিয়ে পড়ে তাড়াহুড়ো করে। মনে মনে তখন হাসি চাপতে পারেনা পারষোত্তম। আবার ভাবে, আহা, মেয়েটার কত কষ্ট। কতদিন ঘরের মানুষটা দূরে রয়েছে, ভাববে না তার কথা!

পারষোত্তম ঘুঙরীর দিকে কৌতুকের চোখ তুলে বলে, ক'জনের জন্যে খানা পাকাচ্ছিস বেটী?

কেন, আপনার আর আমার।

তবে তোকে ভুখা থাকতে হবে আজ।

এখন আর ছলনা নয়, ঘুঙরীর আনন্দ উপচে পড়ল। সে কোন কথা না বলে মুখখানা নীচু করে উপচে পড়া খুশীটুকু চাপতে চাপতে আবার রসুইখানায় গিয়ে ঢুকল।

বাইরে খাটিয়ার ওপর বসে মামা ভাগ্‌নেতে রাজ্যের কথা হচ্ছিল। রসুই ঘরে খানা পাকাতে পাকাতে কান খাড়া করে অম্‌রুর কথাগুলো গিলছিল ঘুঙরী। সাধারণ টুকরো টুকরো পথের কথা, তবু কি অসাধারণ আস্বাদ তার।

বুড়ো চাকর তুম্‌সারাম অম্‌রুর ভেড় বক্‌রিগুলো ওরিতে ঢোকাতে হিমসিম খাচ্ছিল। বুড়ো মানুষ, ভেড়াগুলোকে বাগে আনে তো বক্‌রি-গুলো ভেগে যায়। এমন পেটুক জানোয়ার ভূ-ভারতে নেই। যা দেখে তাতেই মুখ দিয়ে পরখ করতে ছোটে। শুধু চেনে একটি গাছ বিছুটি। ভুলেও তার ছায়া মাড়াবে না।

অম্‌রু ছুটল তুম্‌সারামকে সাহায্য করতে। পারষোত্তম ক্ষেপে গিয়ে গাল পাড়তে লাগল, খানায় কমতি নেই, খালি কাম করতে গেলে বুখার এসে যায়। দেব ভাগিয়ে এবার।

মালিকের মন্তব্যে তুম্‌সারাম দ্বিগুণ তৎপর হয়ে ওঠে। যত তৎপর তত কাজে ভণ্ডুল। জিভে আওয়াজ তুলে দুহাত দুদিকে বাড়িয়ে যত

ঘিরে রাখতে চায় ততই এদিক ওদিক ছিট্‌কে পড়ে বক্‌রিগুলো। যেন বুড়ো মানুষটার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। দু' একটা লহরীতে (বাড়ির সংলগ্ন বাগান) ঢুকে পড়ে বুল্‌ বুল্‌ করে নরম পাতা ছিঁড়ে চিবুতে থাকে। অম্‌রু দলটাকে ওরিতে ঢোকাতে ডুম্‌সারামকে সাহায্য করে।

পারষোত্তম যত হম্বিতম্বিই করুক না কেন, বুড়ো ডুম্‌সারাম ছাড়া তার একদণ্ডও চলে না। বাপের আমলের লোক। ছোটবেলা তার দৌরাত্ম্য ডুম্‌সারাম অনেক সামলেছে। ভাগিয়ে দেবার কথা দিনে বিশবার মুখে আনলেও ভগবান না কেড়ে নিলে ডুম্‌সাকে তাড়ায় কে?

রাতে প্রথম কথা বলল ঘুঙরী, আবার ভুবু জোৎ পেরুচ্ছ কবে?

মামাজী বলছে এখানে বিশ পঁচিশ রোজ কাটিয়ে যেতে।

না আসলে তো পারতে।

অম্‌রু বুঝতে পারে তার এই স্বল্পকাল অবস্থিতির জন্য ঘুঙরী ক্ষুব্ধ। সে প্রবোধ দেবার গলায় বলল, আবার শিবরাত্রির এক মাহিনা আগে এসে হাজির হব। চেত্‌ মাহিনার আগে আর ধরমশালা থেকে নড়ছিনা, দেখো।

ঘুঙরা এবার অন্ধকার বিছানায় অম্‌রুর একখানা হাত নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

চাপা গলায় অম্‌রুর উদ্বেগ, কি হ'ল, কাঁদছ কেন? আমি তো এসে পড়েছি।

তবু কান্না থামেনা ঘুঙরীর। এত দিনের জমে থাকা অদর্শনের মেঘ অনেকখানি জল ঝরিয়ে তবে শান্ত হল।

আমি তোমার সঙ্গে যাব।

অম্‌রু প্রবোধ দিয়ে বলে, বাচ্চা পেটে না এলে ঠিকই নিয়ে যেতাম। শীতের চারণে যখন ওরা নীচের ভ্যালিতে ঘোরে তখন অনেকেই বউ বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে যায় কিন্তু গ্রীষ্ম বা বর্ষায় উঁচু পাহাড়ে ভেড় বক্‌রি নিয়ে যাবার সময় সাধারণত মেয়েদের সঙ্গে নেয় না।

ঘুঙরী বলল, তোমার ওপরের পাহাড়ে ভেড় নিয়ে যাবার আগেই

বাচ্চাটা কোলে এসে যাবে। আমি ওকে নিয়ে যাব, তুমি কথা দাও।

দো এক মাহিনার বাচ্চা, ওকে নিয়ে যাওয়া, মামাজীকে পুছতে হবে।

পারষোত্তমের নামে দমে যায় ঘুঙরী। যতই প্রাণ চাক্ মামাজীর কথা ঠেলবার উপায় নেই। সব কিছুতে পারষোত্তম তাদের দুটো হাত দিয়ে আগলে রেখেছে।

আবার কান্না, এটা অক্ষমতার হাহাকার।

অনেক বোঝাল তাকে অম্রু। বলল, তারও কি ঘুঙরীকে ছেড়ে একা একা ঘুরতে দিল চায়। উড়াঙ্কারের কাণ্ডায় শুয়ে হররোজ সে তো ঘুঙরীরই স্বপ্ন দেখে। পহাল হয়ে না জন্মালে সে ঘুঙরীকে নিয়ে কাংড়ায় ক্ষেতির কাম করে জীবনটা কাটিয়ে দিত। যদি ঘুঙরী চায় তাহলে এখন থেকে সে মামাজীর ক্ষেতি আগলাবে।

ঘুঙরী সঙ্গে সঙ্গে অম্রুর মুখে তার হাতখানা চাপা দেয়।

ও কথা বলতে নেই। আমার যত কষ্টই হ'ক, মামাজীর ক্ষেতি আগলে এখানে তুমি পড়ে থাকবে সে আমি বরদাস্ত করতে পারব না। পিতাজী জিন্দা থাকতে বলত, চলার জন্যেই জন্মেছে গদ্দী পহাল। তার পায়ের তলায় পথ আর মাথার ওপর আসমান।

একটু থেমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আচ্ছা এ সাল তুমি একাই যাও, আসছে সাল থেকে আমি তোমার সাথ চলব। আমি আর মন খারাপ করব না।

অম্রু ভাবে কত নরম মন ঘুঙরীর, আবার কত বুঝদার। সে ঘুঙরীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদরে সোহাগে ভরে দেয়। তার নরম মসৃণ পেটের ওপর হাত বুলিয়ে অনাগতকে আদর জানায়। কানটা পেটের ওপর চেপে ধরে বলে, সাড়া পাচ্ছি। হাই তুলে পাশ ফিরল বেটা বাহাদুর।

ঘুঙরী দুহাতে অম্রুর মুখখানা তুলে ধরে কান্না ভেজা গলায় বলে,

কি করে মালুম হ'ল তোমার, ও বেটা আছে? আমার বেটী বহুৎ পসন্দ্।

অম্রু অমনি মাথা দোলাতে দোলাতে বলে, মালুম নেই, মালুম নেই, ঝুটমুট্ বলছি।

এবার ঘুঙরী যেন অম্রুর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চায়, বেটা-বেটী সবকুছ আচ্ছা। সব দেওতার দান।

অম্রু ঘুঙরীকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, খুব ঠিক। যে আসবে সে আমাদের দিল্ খুশীতে ভরিয়ে দিতে আসবে।

পঁচিশটা দিন দেখতে দেখতে হাইউন্দের (শীত) হাওয়া লাগা প্রিগাছের পাতার মত উড়ে চলে গেল। পহাল অম্রু তার ভেড় বক্রির দল নিয়ে ভুবু জোতের পথে কুলু উপত্যকার দিকে রওনা দিল।

ঘুঙরী চায়না অম্রু তার মামার বাড়িতে ক্ষেতির কাম নিয়ে বসে থাকুক। যে পহাল, সে জন্মেছে চলার জন্য। সব জানে, সব বোঝে ঘুঙরী। তবু একেবারে আপনার জন দূরে চলে গেলে মন কাঁদে। মনে হয় কতকিছু বলার ছিল মানুষটার কাছে, কিছুই তো বলা হ'লনা। এখন সে কোথায় চলেছে? পাহাড়ের কোলে বয়ে চলা নদী পেরিয়ে সে হয়ত চলেছে তার ভেড়ার পাল নিয়ে।

গুন গুন করে গান আসে ঘুঙরীর গলায়—

ও গয়ে সজন ও গয়ে
লংগি গয়ে দরায়া
বজ্জি নি কীত্যাঁ গল্লন্‌গুড়িয়াঁ
সদে দিলে দা চুকেয়া নি চা।

নদী পেরিয়ে আমার প্রিয় তার কাণ্ডার দিকে চলে গেছে। হায়, মন ভরে দুজনে দুটো কথা বলব, কি শুনব, তার সুযোগ পেলাম না।

শীত পাহাড় পর্বতের গায়ে তুষারের সাদা সাদা চাদর জড়িয়ে দিচ্ছে। এ সময় যত নীচে নামা যায় ততই মঙ্গল। মাঝে মাঝে শীতের দিন-

গুলোতেও পশলা পশলা বৃষ্টি নেমে আসে। তখন ভেড়্-বক্রির দল নিয়ে কুদে (গুহা) আশ্রয় নিতে হয়।

ভুবুজোৎ পেরিয়ে অম্রু উপত্যকায় নামবার সময় তেমনি এক ঝড়ের মুখে পড়ল। ক্যায়ল (চীর পাইন) বনের ভেতর দিয়ে চলছিল। তখন কলেল (সন্ধ্যা) দ্রুত ছেয়ে ফেলছে চারদিক। বনের ভেতর ছায়া গভীর হয়ে উঠছে। হঠাৎ ঝড়ের শাসানি, সঙ্গে চড়বড়িয়ে বৃষ্টি। অম্রু হুঁসিয়ার। গদ্দীমাত্রেই চলার পথে হুঁসিয়ার। তবু ভুল হয়ে যায়। রাস্তা কমাতে গিয়ে বনের ভেতর ঢুকে এই বিপত্তি। ঘুঙরীর কথা ভাবতে ভাবতে চলেছিল অম্রু। ঘন বন। আকাশের চেহারা স্বচ্ছ ছিল না। হঠাৎ হৈ চৈ পড়ে গেল ক্যায়ল বনে। ছোট ছোট ডালপালা ছিঁড়েখুঁড়ে সে এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়ছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে। চিল্লাতে লেগে গেছে ভেড়্-বকরির বাচ্চাগুলো। থেমে গেছে পুরো দলটা। গদ্দী কুত্তর (কুকুর) সামনে বিপদ বুঝে তাদের আগলে রেখেছে। এখন প্রভুর সিঙ্কের (চলার নির্দেশ-জ্ঞাপক শিস্) জন্য কান খাড়া করে অপেক্ষা।

অম্রু এই মুহূর্তে নিরুপায়। বনের বাইরে বেরুতে গেলেই তীব্র ঝড়ের ঝাপটার মুখে পড়তে হবে। বন পেরিয়ে খানিকটা পাহাড়ী পথ ভাঙলে তবে পরিচিত কুদ। সেখানে আশ্রয় মিলবে।

অম্রু দাঁড়িয়ে রইল ঠায়। সামনে ভেড়ার পাল আর কুত্তর। অসহায় জীবগুলো অতর্কিত আক্রমণে নিজেদের গুটিয়ে এক বস্তা তুলোর তালের মত সিঁটিয়ে আছে। বিয়ানার (ঝড়ের) দাপটের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ গুড়কানা (বাজ)। দু' একটা বকৃরি তরাসে আর্তনাদ করে উঠল। গুড়কানার আওয়াজটা ঘুরে ঘুরে বাজতে লাগল পাহাড়ে পাহাড়ে।

অসময়ের বৃষ্টি, আসাও যেমন আচমকা, যাওয়াও তেমনি। কিন্তু মেঘ উড়ে গেলেও আঁধার কাটল না। কলেল (সন্ধ্যা) তখন আর পাতলা নেই, রাতের কালো চাদরে গা ঢেকেছে।

হঠাৎ অমরুর চোখে পড়ল এক টুকরো আলো। বনের ভেতর দপ্ দপ্ করছে। এখন কুদের দিকে যাবার কোন প্রশ্নই নেই। ঐ আলোটুকুই এখন তার কাছে একমাত্র ভরসা। সে তার বাহিনীকে কুণ্ডরের জিম্মায় রেখে আলোটা লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল।

একটু তফাৎ থেকেই অমরু দেখল, একটা লোক বনের ভেতর লকড়ি জড়ো করে আগ লাগিয়েছে। লোকটার পাশে শুয়ে আছে একটা ভঁইস। ক্যাইল গাছের পাতাগুলো আগুনে ফেলে দিতেই চিড়্ চিড়্ করে শব্দ উঠল।

আগুনটা জোরে জ্বলে উঠতেই অমরু দেখতে পেল তিন চারটে ক্ল্যাঁ (পাইন) গাছের কাণ্ড ঘিরে একটা মাচান বাঁধা। মাচানটা জমিন থেকে হাত আট-দশ ওপরে।

অমরু আগুনের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা চমকে তাকাল। সে প্রথমটা ভাবতেও পারেনি যে ওখানে এ সময় কোন আদমী এসে দাঁড়াতে পারে। বড় জোর ভাবা যায় একটা রিচ (পাহাড়ী ভালুক) ঝড়বাদলে আস্তানার পথ ছেড়ে বিপথে চলে এসেছে।

লোকটি তার দিকে বেশ কিছু সময় তাকিয়ে আছে দেখে অমরু বলল, বুঝতেই পারছ ভাইসাব, আমি পহাল। পুরো দল নিয়ে ঝড়ে আটকা পড়ে গেছি বনের ভেতর। নীচের কুদ গুহা অবধি যাবার মত আলো নেই। এখানে আলো জলতে দেখে চলে এলাম।

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই আস্তানার পাশেই এক চিলতে বিয়াল (সমতল তৃণভূমি) আছে। ওখানে আজ রাতের মত তোমার ভেড় বক্‌রির গোঠ (যেখানে ভেড়্-বক্‌রি রাতের বিশ্রাম নেয়) বানাতে পার।

বাঁচলাম ভাই। পুরো দলটাকে তাহলে এখানে নিয়ে আসি।

এখন কলেল ঘানয়ে উঠেছে। একটু সবুর কর। এক পর (প্রহর) যেতে দাও, চানানি (চাঁদ) উঠবে, তখন নিয়ে এসো।

লোকটি অমরুকে আগুনের পাশে বসতে ইঙ্গিত করে নিজেও

বসে পড়ল।

আমি তোমাকে নারেলি (হুঁকো) ছিলম (কল্কে) কিছুই দিতে পারব না। ওসব আমার কাছে নেই। আর থাকলেও পারতাম না।

অম্রু অমনি বলল, সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না।

নিজের কোমরে ঝোলান বগ্‌লি (চামড়ার ব্যাগ) থেকে ছিলম (কল্কে আর তামাকু বের করে সামনের আংরা তুলে জুৎ করে সাজাল। দু'এক টান টানতেই বুলবুলিয়ে ধুয়ো বেরিয়ে এল। অমনি সে ছিলমটা এগিয়ে ধরল লোকটির দিকে।

মানুষটা মুহূর্তে যেন কুঁকড়ে গেল। অস্পষ্ট গলায় বলল, আমি দাগা (অচ্ছুৎ)।

প্রথমটা অম্রু কিছু না বলে আবার টানতে লাগল। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। সামনের আগুনের ঝলকে শীতের হায়েনাগুলো সরে সরে পালাচ্ছে। ছিলমে কয়েকটা সুখ-টান দিয়েই অম্রু মৌজ হয়ে বসল। দিলটা এখন তার রোদেভরা আসমানের মত খুশীতে ভরে উঠেছে। সে বুঁদ হয়ে বসে ছিলম সমেত ডান হাতখানা বাড়িয়ে ধরল লোকটার দিকে।

মানুষটার দুটো চোখের দৃষ্টি এখন অম্রুর মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। সে কিন্তু ছিলমের দিকে হাত বাড়াল না।

এবার অম্রু গা ঝাড়া দিয়ে লোকটার দিকে ঝুঁকে বলল, পিয়ো দোস্ত্।

অম্রুর উদারতা তার চোখে মুখে উপচে পড়ছে।

লোকটি সংকোচের সঙ্গে দুটো হাত বাড়িয়ে অম্রুর ছিলমটা ধরে নিল। তারপর অম্রুর দিকে পেছন ফিরে বসে দু'হাতের মাঝখানে ছিলম ধরে টানতে লাগল।

এক বড় জাতের মানুষ কৃপা করে তার হাতে ছিলম দিয়েছে ; তা বলে তার মুখোমুখি বসে তো তামাক খাওয়া যায় না।

সেদিন ঐ আগুনের তাতে মক্কির রুটি পাকাল অম্রু। মাটির

তলা থেকে একটা বুনো আলু খুঁড়ে এনে দিল লোকটি। তাই পুড়িয়ে একটা সব্জি বানান হল। ভঁইষের দুধে রুটি ছুপিয়ে দুজনে পরমানন্দে খেল।

আচম্‌কা বৃষ্টিতে ভিজে সদ্য লোমছাঁটা ভেড় বক্‌রিগুলো বেশ জবুথবু হয়ে পড়েছিল। চাঁদ উঠলে তাদের নিয়ে আসা হ'ল আগুনের ধারে। তারা তাত (তাপ) পেয়ে শুয়ে পড়ল থাবড়ে থুবড়ে। কুত্তর দুটো কিন্তু আগুনের ধারে কাছে ভিড়ল না। বনের দুদিকে শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনায় সজাগ হয়ে রইল।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে আর একবার ছিলম টেনে দুজনে ক্ল্যা গাছের একটা খাঁজকাটা কাণ্ড বেয়ে ওপরের মাচানে উঠে গেল।

রাতে বুনো জানোয়ারদের ডাকহাঁক উঠল। কুত্তর দুটোও সমানে চেঁচিয়ে বিক্রম প্রকাশ করতে লাগল! অম্‌রু ঘুম ভেঙে জেগে উঠল মাঝে মাঝে। মাচানে চাপানো পারালের (ধানের খড়) চালার ছোট্ট একটা ফুটো দিয়ে কখনো সে বৃষ্টির চিহ্নহীন নির্মল আকাশটা দেখল। নীচে উঁকি মেরে দেখল ঘুমন্ত ভেড়গুলোকে। শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে দেখতে লাগল ঘরে ফেলে আসা ঘুঙরীকে। পেটে বাচ্চা নিয়ে সেও কি এখন ভাবছে তার মানুষটার কথা? সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ঘুঙরীর চোখ খোলা, আর সে চোখের দৃষ্টি ঘরের দরজা চৌকাঠ পেরিয়ে, গ্রাঁ (গ্রাম) আর টিকার (কয়েকটি গ্রাম যখন একসঙ্গে মিলিত হয়) পাশ কাটিয়ে অনেক পাহাড় উপত্যকা পেরিয়ে এই জঙ্গলে এসে ঠেকেছে।

পাশের লোকটা কিন্তু নির্বিকার শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। অম্‌রুর মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। আপদের সময় যে দু হাত বাড়িয়ে আগলায় সে তো সত্যিকারের দোস্ত্।

আচ্ছা, মানুষটা একা একটা ভঁইষ নিয়ে বনের ভেতর কাটাচ্ছে কি করে! ওর বাড়ীঘর আছে তো, না নেই?

এইসব ভাবনার ভেতর অম্‌রু একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

জুসমুসার (ভোর) আবছা কেটে বিহাগের (সূর্যোদয়) আলো ফুটল। বনের ভেতর সে আলোর ডালপাতা ফুঁড়ে ঢুকে পড়তে বেশ খানিকটা সময় লাগল।

অম্‌রুর উঠে বসার আগেই লোকটি নীচে নেমে গিয়েছিল। সে এরই ভেতর আগুন জ্বেলে, দুধ দুইয়ে কাজ হাসিল করেছে। ভঁইষের ছোট্ট বাছুরটার সঙ্গে খেলায় মেতেছে বক্‌রির দুটো বাচ্চা।

অম্‌রু নীচে নেমে আসতেই লোকটি বলল, ঐ যে দোস্ত্‌, তোমার দুধ আমি আলাদা করে রেখেছি। তোমার পাত্রে ঢেলে ওটুকু গরম করে নাও।

অম্‌রু এসে আগুনের ধারে বসল। শীতের হাওয়ায় এরই ভেতর কামড় শুরু হয়ে গেছে। তবে অমরুদের শীতবোধ অনেক কম। তারা যখন ওপরের পাহাড়ে চারণের জন্যে যায় তখন কড়া শীতের ভেতরেই তাদের কাটাতে হয় মাসের পর মাস। তবু আগুনের পাশে বসলেই একটা আমেজ আসে। বেশ মৌজ করে তামাকু খাবার একটা ইচ্ছা জেগে ওঠে।

অম্‌রু ছিলম আর তামাকু বের করে সাজল। নিজে দমভোর টেনে নিয়ে লোকটির দিকে এগিয়ে ধরল। ঠিক গত রাতের মত অম্‌রুর চোখ আড়াল করে সে ছিলম টানতে লাগল।

কি নাম তোমার ভাই ?

লোকটি তেমনি পেছন ফিরেই বলল, দুলিরাম।

তা বেশ নাম। খাস ডেরা কোথায় ?

এই আমার খাস ডেরা। সাবেক আস্তানা জানতে চাও ?

অম্‌রু অল্প হেসে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইল।

দুলিরাম বলল, কুলু জিলার ঢাল ময়দানের লাগাও।

যেখানে দশেরায় মেলা বসে ?

বিলকুল ঠিক্‌।

আরে দোস্ত, ও আস্তানা তো সবসে আচ্ছা। বিপাশা নদীর

কিনারে। তা এমন জায়গা ছেড়ে এখানে বনবাদাড়ে এলে কি করে?

লোকটা নিজের কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, বরাত।

কি রকম? হাঁ, তবে সংকোচ থাকলে বলে কাজ নেই।

আরে ভাই, সব ছেড়ে চলে এসেছি। বিমারী হয়ে বহু মারা গেল, আমি তখন জঙ্গলে ঠিকাদারের গাছ কাটছি। বন উজাড় হল আর আমি ঘরে গিয়ে শুনলাম জোয়ান বহুটা মরেছে। আমার মনে হল, গাছ কাটার পাপে আমার এমনটা হল। কত ফুল, কত ফলের গাছ কেটে আমি মাটিতে ফেলে দিয়েছি। কত পঞ্ছীকে আমি বাসা ছাড়া করেছি। ডালে ডালে কাঠবেড়ালীর নাচ আমি একদম বন্ধ করে দিয়েছি। এদের অভিশাপ ঠেকাব কি দিয়ে দোস্ত্।

অমরু বলল, তোমার তো এতে কোন দোষ নেই ভাই। তুমি জংলাৎ ম্যাকমায় কাজ নিয়েছ। ঠিকাদারের হুকুমে কামকাজ করেছ। দোষ হলে তার, তোমার কি?

অন্যমনস্ক বিষণ্ণ গলায় ভুলিরাম বলল, বহু মরল, মানুষজনের সঙ্গে থাকতে আর দিল চাইল না। বনেই পালিয়ে এলাম।

এখন ঠিকাদারের কাছে কাম কর না?

না। বহুৎ পাপ করেছি, আর না। এক টুকরা ক্ষেতি আর এই ভঁইষ। গাছের ডালে পঞ্ছীর মত বাসা বানিয়েছি। খাসা আছি দোস্ত্।

লোকটিকে দেখে, তার সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল অমরুর।

এবার অমরুর আর এক প্রশ্ন, বালবাচ্চা নেই?

ভুলিরাম মাথা নেড়ে জানাল তার কোন বাচ্চাকাচ্চা নেই। দো বরষ সাদি হয়েছিল, দো মাহিনাও বহুর সঙ্গে সে কাটাতে পারেনি।

অমরু বলল, বহু তোমাকে তার কষ্টের কথা জানাত না?

ভুলিরাম দীর্ঘশ্বাস ফেলল! স্মৃতি হাতড়ে বলল, আমি যখন তার

কাছ থেকে চলে আসতাম, তার আঁখ থেকে আঁসু ঝরত। সে একবার একটা দুঃখের গান গেয়ে তার মনের কথা জানিয়েছিল।

আপুন ভি নই আউন্দা ও
লিখি ভি নই ভেজ্‌দা
কীয়া তন্ কাট্‌নি ও
বলারি বরেষ।

তুমি ঘরে আস না, কোন খবরও পাঠাও না। বল, আমি আমার এই যৌবনের দিনগুলো কেমন করে কাটাই।

খানিক সময় গভীর একটা দুঃখকে বুকে চেপে ধরে দুলিরাম আবার বলল, মানুষের দুনিয়ায় বাঁধা থেকে কি হবে দোস্ত্, যদি বহু বেটার কাছে থাকতে না পারলাম।

সাচ্ বাৎ, বলে অমরু দোস্তের দুঃখে সান্ত্বনা জানাল।

বড় কষ্টে পুরুষদের রুজি রোজগারের ধান্দায় বেরুতে হয়। তখন সঙ্গীহারা মেয়েরা কান্নায় বুক ভাসায়। বিদায়ের সময় মেয়েরা একান্তে তার পুরুষকে হাতের বাঁধনে জড়িয়ে ধরে বলে,

ক্ষেতিয়া কানক কুপাহ্
মেঁ কান্‌তেন তু খা
পরদেশ ন যা
পরদেশন্ দি মমলে জি তোলা মন্দ্‌রে।

ক্ষেতিতে গম আর তুলো ফলবে। আমি তোমার খানা বানিয়ে দেব, কাপড় বুনে দেব। ওগো আমার মনের মানুষ, তুমি পরদেশে যেওনা, যেওনা, যেওনা।

এসব দুঃখের গান পাহাড়ী অঞ্চলের মেয়েদের মুখে মুখে ফেরে। তাদের বুকের মোচড় থেকে এ গানের জন্ম। চোখের জলে এর বেড়ে ওঠা।

তবু চলে যেতে হয়। গরীব মানুষের সাধ, আহ্লাদের সময় কই। জান বাঁচানোর তাগিদে ভালবাসার কথা ভুলতে হয়।

অমৃরু দুধ গরম করল। দুলিরাম তার ছোট্ট ক্ষেতি থেকে তোলা দু' দুটো মকাই এনে দিল। অমৃরু তাই পুড়িয়ে নিমকে ছুপিয়ে খেতে লাগল।

তুমি যে এখানে ডেরা বেঁধে, ক্ষেতি করে রয়েছ, জংলাৎ ম্যাকমার (বনবিভাগ) কোন লোক কিছু বলে না ?

ওরা এলে বলি, ভঁইষের দুধ পিয়ো। মকাই দিয়ে খাতির করি। ওরা আর তাড়া লাগাবার ফুরসৎ পায় না।

অমৃরু বলল, তোমার জীবনটা ভাই মন্দ না, বেশ কেটে যাচ্ছে একা একা।

দুলিরাম উৎসাহিত হয়ে উঠল, একা নই দোস্ত্, সারাদিন অতিথির কম্‌তি নেই। জুস্‌মুসা (ভোর) থেকে কলেল (সন্ধ্যা) শয়ে শয়ে পঞ্ছী উড়ে আসে গাছের ডালে। আমার চারপাশে নেমে এসে ঘুরে বেড়ায়। চিড়ি (চড়াই), ঘাটারী (শালিক জাতীয় পাখি) নেচে নেচে খাবার চায়। আমি ওদের মক্কির দানা খাওয়াই। আর দু'জন গাছ থেকে আদ্দেকটা নেমে এসে ওদের খাওয়া দেখে। একেবারে নেমে আসতে সাহসে কুলোয় না।

অমৃরু কৌতূহলী হয়ে উঠল, কাদের কথা বলছ ?

কাঠবেড়ালী দুটো। এই গাছেই বাসা বেঁধেছে। পাখিগুলো চলে গেলে ওরা আমার কোলে লাফিয়ে উঠে আসবে। হাতে খাবার তুলে ধরতে হবে। ওরা কুট কুট করে খাবে। ল্যাজ তুলে ছুট লাগাবে। আবার এসে খেয়ে যাবে।

ওদিকে ঝাঁক ঝাঁক তোতা (টিয়া) গাছের ডাল ছেয়ে ফেলবে। মালুম হবে, গাছ ভরে গেছে সবুজ পাতায়। আবার উড়ে চলে যাবে ঝাঁক বেঁধে। কখনো ঝুঁটি দুলিয়ে চটি পিন্‌ঝা (বুলবুলের মত পাখি) আসবে। ঘুঘি (ঘুঘু) ডাকবে ভারধূপে (মধ্যাহ্নে)।

একটু থেমে দুলিরাম বলল, আমার সঙ্গীসাথী বলতে এরাই আছে দোস্ত্।

অম্‌রু বলল, এদের মত আপনার জন আর কে-ই বা হবে।

আপন মনে বলে চলে ঢুলিরাম, একদিন যে হাতে পেড় (গাছ) কেটে মাটিতে ফেলেছি, সেই হাত পেড়ের গায়ে বুলোই। আঁখ মেলে দেখি, পাতা ঝরল, ফিরে পাতা এলো। ফুল ফুটল, ফল ফলল। আগ লাগাবার জন্যে শুখা ডাল যোগাড় করে আনি। কাঁচা ডাল আর কাটিনা দোস্ত্।

একসঙ্গে অনেক কথা বলে চুপ করে গেল ঢুলিরাম। খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল অম্‌রুর। সে বলল, এখন উঠি দোস্ত্। ফিরে এ পথে যাবার সময় আবার কোনদিন তোমার ডেরায় হাজির হব।

ঢুলিরাম উঠে দাঁড়িয়ে তার হঠাৎ পাওয়া অতিথির হাত ধরল।

দু' দণ্ড তোমাকে কাছে পেয়ে দিল খুশ হয়ে গেল দোস্ত্। আপনা মনে করে ফের চলে আসবে।

অম্‌রু তার ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে চলল নীচের পাহাড় লক্ষ্য করে। পিঠে বাঁধা রুবানা (বাদ্যযন্ত্র), হাতে কুলহার (কুঠার)। সংকীর্ণ পাহাড়ী পথে ভেড়্-বক্‌রিগুলো ছুই এর (পাহাড়ী স্রোতধারা) মত তরতরিয়ে নেমে যাচ্ছে। অম্‌রু তাদের পাশে পাশে একটার পর একটা টোহলে (পাথরের চাঁই) লাফ দিতে দিতে চলেছে। হাতের কুলহারখানা হাওয়ায় চালিয়ে শরীরের ভার সামলাচ্ছে। সামান্য এক চিলতে ফাঁকা জায়গায় ঘাস গজিয়েছে, অমনি নিমেষে তাকে মুড়িয়ে ফাঁকা করে দিচ্ছে অম্‌রুর বাহিনী।

নীচের কাণ্ডায় সেদিনের মত যাত্রা-বিরতি। বেলাশেষের রোদ্দুরে তেজ নেই। মরা সোনার মত আলোটুকু গাছের ডালপালা থেকে গড়িয়ে ভেড়্-বক্‌রিগুলোর গা ধুইয়ে দিয়ে একটা কুহলের (চাষের জন্য প্রবাহিত জলধারা) স্রোতে মিশে নীচের উপত্যকার দিকে তরতরিয়ে নেমে গেল।

অম্‌রু সবুজ ঘাসের গালচেতে বসে রুবানা বাজাতে লাগল। আজ কেন জানি না, কাংড়ার রাজা সংসারচাঁদের কাহিনীটা ফিরে

ফিরে বাজাতে লাগল তার রুবানায়। ডানদিকে মাথার ওপরে বন। বন চিরে একটা পাহাড়ী ছুই (জলধারা) নেমে যাচ্ছে নীচে। আর খানিক সন্ধ্যা নামলে বনের প্রাণীগুলো আসবে ঐ ছুই-এর জলে গলা ভেজাতে।

রুবানায় ঝম্ ঝম্ করে বেজে উঠল ভয় মেশান একটা সুর। বাতাস কাঁপিয়ে সে সুর ফিরতে লাগল চারদিকে। সুরের ঢেউগুলো নীচে থেকে উঠে চলল ওপরে বনের দিকে।

অমরু রুবানায় হাত চালাচ্ছে আর ছবি দেখছে। কাংড়ার রাজা সংসার চাঁদ বনে এসেছেন মৃগয়ায়। লোক-লস্কর হাঁকা ছেড়ে কাঁপিয়ে তুলছে বন। পশুপাখি পালাচ্ছে ডর লেগে। কিন্তু পালাবে কোথায়? সংসার চাঁদের লক্ষ্য কখনও ফস্কায় না। যেদিকে হাতিয়ার চালাচ্ছে, সেদিকেই বিঁধে যাচ্ছে শিকারের গায়ে।

বনের ভেতর এত ঢাকবাদ্যির আওয়াজ শুনে কৌতূহলী হয়ে ছুটে এল এক গদ্দান (গদ্দীদের মেয়ে)। যুবতী, সবে সাদি করে তার আদমীর সঙ্গে এসেছে ভেড়-বক্রি চরাতে।

রাজার চোখ পড়ল তরুণীটির ওপর। এত রূপ! এত সুন্দর নজর! রাজা সংসারচাঁদ মুগ্ধ। তরুণী গদ্দানটি রাজার চোখে দেখল ভালবাসার আলো। তারও দিল টলল রাজাকে তার ভাল লেগেছে কিন্তু তার আদমী! সে যে মিশে আছে আর প্রতিদিনের জীবনে। এই দোটানায় পড়ে ভেঙে গেল তরুণী গদ্দানের বুকখানা।

কোন একদিনের এই সত্য ইতিহাসটুকু গদ্দীদের লোকসংগীতে আশ্রয় নিয়েছে। এখন মুখে মুখে গান হয়ে ফিরছে সেই রাজা সংসারচাঁদের কাহিনী।

রুবানার সঙ্গে এবার গলা ছেড়ে গাইতে লাগল অমরু—

রাজা সংসারচাঁদ হেরে যো চলায়া
গদ্দন তামাসে যো আয়ি
মেরি বঁকিয়ে গদনী

থোরি থোরি বেদন্ রাজে দি লগদি
গদিয়ে দি লাগি যন্দি চুড়ি
মেরিয়া বঁকিয়ে গদিয়া।

একসময় রুবানা থামিয়ে ঘুঙরীর কথা ভাবতে লাগল অমৃক। না, তার ঘুঙরী কাউকে দিল দেবে না। আর কোন আদমী তার খোঁড়া বন্ধুর দিলও চুরি করবে না।

কদিন চলার পর একটা ছই-এর (পাহাড়ী স্রোতধারা) সামনে এসে দাঁড়াল পুরো দলটা। পাথরের চাঁইগুলোর ওপর আছড়ে পড়ছে জল। গর্জন করতে করতে ফেনা ওগরাচ্ছে ছইটা।

এখানে সাবধানে নীচের দিকে নামতে হবে। তারপর উপত্যকায় পৌঁছে কোন একটা টাংড়ির (সাঁকো) ওপর দিয়ে পেরিয়ে যেতে হবে ওপারে।

দলবল নিয়ে হুঁশিয়ার হয়ে নামছিল অমৃক। এমন সময় একটা ছাল্লির (শিশু ছাগী) মিহি গলার আওয়াজ তার কানে এসে পৌছল। চমকে নিজের বাহিনীর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দেখল সে। নাঃ, তার দলের কেউ পিছনে পড়ে যায়নি। এসব জায়গায় চলার একটু ভুল হলেই মাশুল দিতে হয়। ফি বরষ নদীর জলে পড়েও যায় দু'দশটা ভেড়্-বক্রি। তবু এই বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েই এ পথে চলতে হয়।

অমৃক এখন ওপারের দিকে কৌতূহলী চোখ মেলে চেয়ে আছে। ওপার থেকে একটা দল নামছিল। সে দল থেকে একটা ছাল্লি (শিশু ছাগী) একটুখানি নীচে গড়িয়ে পড়েছে। পড়বি তো পড়, একটা পুরু ঘাসের জমিনে। তাই বরাতে বেঁচে গিয়ে এখন চিল্লাতে শুরু করেছে।

একটা পাথরে কোমরের ডোরের (গদ্দীদের কোমরে জড়ানো ছাগ-লোমের লম্বা মোটা দড়ি) খানিকটা জড়িয়ে পহালটা বাকী দড়িটা ধরে নেমে গেল নীচে। তারপর চোলের (ফ্রকের মত উলের তৈরী

জামা) পকেটে ছাল্লিটাকে পুরে ডোর ধরে পাথরে পায়ের গুঁতো মারতে মারতে উঠে গেল ওপরে।

এবার এপার থেকে হাঁক পাড়ল অম্রু, সাবাস ডেঞ্জু, সাবাস।

ডেঞ্জু নামের পহালটি চমকে তাকাল। অম্রুকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল, আরে দোস্ত্, তুম্ ?

দুজনে এবার সাবধানে ছই-এর দুই তীর ধরে নীচের দিকে নামতে লাগল।

নীচেই টাংড়ি। অম্রু টাংড়ি পেরিয়ে ওপারে গেল। ওপারেই চারণভূমি। দুই দোস্তে প্রথমে ঘুষোঘুষি, তারপর কোলাকুলি হল। বছরে একবার এমনি চারণের ভেতর ওদের দেখা হয়ে যায়।

ডেঞ্জু তার ভেড়্-বক্রি নিয়ে লাহুল থেকে আসছিল রোটাংপাশ পেরিয়ে। সেদিন আর বেশী নীচে নামা হল না; সামনের একটা কাগুায় দু'জনে তাদের ভেড়্-বক্রি ছেড়ে দিয়ে গল্পে মেতে উঠল।

অম্রু দোস্তের পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, কিরে, এ বরষও সাদি হল না ?

না দোস্ত্। দিল-পসন্দ লেড়কি মেলেনি।

সাচ্ বাৎ। দিল-পসন্দ লেড়কি না মিললে জীবনটা বরবাদ হয়ে যাবে। যে জেনানা মনের সঙ্গে মন মিলিয়ে চলতে পারবে তাকেই তো চাই জীবনে। নদীর ধারে, পাহাড়ের ওপর, খোলা কাগুায় ঠাণ্ডী-গরমীতে যে সাথ সাথ থাকবে সেই তো হবে জীবন-সাথী।

দু'বন্ধুতে দিনভর খোসগল্পে কাটিয়ে দিল। রসুই পাকাল।

ডেঞ্জু বলল, দতিয়ালু (দিনের খাবার) আমার। রোটি, দাল আর সব্জি।

অম্রু অমনি বলল, সাঞ্জিয়ালু (সান্ধ্য-ভোজ) আমার।

ঠিক আছে।

গল্পের ভেতর আসল কথাটি এসে পড়ল। অম্রুর আসন্ন পিতৃত্ব লাভের খবর। ডেঞ্জু অম্রুর হাতে ঝাঁকি দিতে দিতে বলল, ভাবী,

দোস্তের হাতে আশমান ফুঁড়ে এক চানানি (চাঁদ) এনে দেবে। জব্বর খুশ খবর।

অম্রু দোস্তের কাছে কথাটা বলতে পেরে মনে মনে ভারি খুশী হয়ে উঠল। তার ঘুঙরী মা হবে। সে হবে বাবা। এ যে অবাক যাদু কি খেল্। কেউ কোথাও নেই, হঠাৎ আমদানী হল একটা খেলনা। হাত-পা ছুঁড়ে, খেলকুদ করে বাড়ী মাতিয়ে দিল।

দুদিন ওরা রইল কাণ্ডায়। এর ভেতর আরও দুটো দল নেমে এল। বেশ বড় চারণভূমি। ভেড়্-বক্‌রিতে ঠাসা। চুরুক্ চুরুক্ ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে চরকির মত।

পহালরা নিজেদের ভেতর মজাদার কথা চালাচ্ছে। বিহানে বক্‌রিদের নিয়ে একটা বাজির লড়াই হল। যে যার দল থেকে মদ্দা এক-একটা বক্‌রি নিয়ে এল। চার দল থেকে এল চারটে বক্‌রি। ইয়া বাঁকা শিংজোড়া।

কাণ্ডার একদিক খালি করে পহালরা ঘিরে দাঁড়াল। কুত্তরগুলো পাহারায় রইল, যেন ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে ভেড়বক্‌রিগুলো ঢুকে না পড়ে। লড়াই শুরু হল দুটো দুটো দলে। মুখে বিচিত্র শব্দ তুলে পহালরা নিজের নিজের বক্‌রিকে মাতিয়ে তুলল।

দুটো পহেলবান ছুটে আসছে পরস্পরের দিকে। মুখোমুখি এসেই সামনের দুটো পা শূন্যে তুলে মুখ কাৎ করছে। পরক্ষণেই দু'জোড়া শিং-এ লাগছে ঢুঁ। আবার পা নামিয়ে কিছুটা হটে এসে সেই শব্দ তুলে শিং-এ শিং-এ ঢুঁ। নিজের নিজের বক্‌রিকে উৎসাহের তোড়ে এগিয়ে দিচ্ছে মালিক।

লড়াই-এ এঁটে উঠতে না পেরে এক একটা বক্‌রি আস্তে আস্তে পিছু হটছে। নির্দিষ্ট রেখার বাইরে হটে গেলেই তার হার।

লড়াই-এ দুটো জিতল। এখন ঐ দুটোর ভেতর আবার শুরু হল শেষ লড়াই। ডেঞ্জু হেরেছে টাম্বুর কাছে। অন্যদিকে অম্রু জিতেছে রৌন্‌কিকে হারিয়ে।

টাসু আর অমরুর দুটো বক্‌রি এবার লড়াই-এ মাতল। ঘামে দুটো জানোয়ারেরই লোম চুপচুপ, চোখ লাল। ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ছে। লড়াই চলছে এগিয়ে পিছিয়ে। ঢুঁ-এর আওয়াজ উঠছে ঠাঁই, ঠাঁই।

পিছু হঠছে টাসুর বক্‌রি। নিজের হারের দুঃখ ভুলে অমরুর বক্‌রিকে গলা ফাটিয়ে মদত দিচ্ছে ডেঞ্জু।

শেষ বাজীমাৎ করল অমরুর বক্‌রি। ডেঞ্জু যেন পুরো লড়াইটাই জিতে গেছে। দোস্তের জয়ে সে ভুলে গেছে তার নিজের হার। অমরুর বক্‌রিটাকে শূন্যে তুলে খুশীতে ফেটে পড়ছে।

যারা হারল লড়াইতে তারা একবেলা করে খাওয়াবে বিজয়ীকে। আর শেষ বিজয়ী অমরু তিনবেলা খাবে তিন হেরোর রান্নায়।

নাচ শুরু হয়েছে জোছনা রাতে। দারুণ বেগে ঘুরে ঘুরে পহালদের নাচ। প্রভুদের দেখাদেখি কুত্তরগুলোও উল্লাসে ছুটোছুটির খেলায় মেতে উঠেছে। ভেড় বক্‌রিগুলোর কেউ বা শুয়ে কেউ বা দাঁড়িয়ে। দিনভর খাবার পর ঝিমুনি এসেছে তাদের।

ওপারের পাহাড়ে পাহাড়ে তোষগাছের (ফার) বন। একটা কাঠখুরু (কাঠঠোকরা) পাখি ফিনিক ফোটা জোছনাকে দিন ভেবে ঠুক্‌ ঠুক্‌ কাঠ ঠুকে চলেছে।

নাচের পর বাজনা। অমরুর হাতের টানে রুবানা স্বপ্ন ছড়ায়। ওরা কেউ ঘাসের বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় কেউ বা হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে বাজনা শোনে। জোয়ান পহালদের মন সুরের ছোঁয়ায় উদাস হয়ে যায়। ঘরে ফেলে আসা আপনজনদের জন্যে হু হু করে ওঠে মনটা।

দু' চারদিনের ভেতরেই ঘাস ফুরোয়, সুখের হাট ভাঙে। ডেঞ্জু আর অমরু একপথে চলে, অন্যেরা যায় তাদের নির্দিষ্ট কাণ্ডায়।

এখন সৈরী (শরতের ফসল) তোলা হয়ে গেছে। মকাই শুকোচ্ছে ঘরের ছাদে। সোনার দানায় গাঁথা মকাই ছাদে ছাদে ঝলসাচ্ছে।

যে কেউ কোন মোকামের পাশ দিয়ে যাচ্ছে তার চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে ঐ মকাই-এর সোনালী রঙ।

কে যায়, অম্রু ? আরে, ক্ষেতি পার হয়ে যাচ্ছ কোথা ? এস আমার ক্ষেতে। দো-চার রোজ তো থাক এখানে।

অম্রু উত্তর দেয়, আসছি চাচা, সামনের নালুতে (সংকীর্ণ জলধারা) ভেড়্-বক্রিগুলোর তেষ্টা মিটিয়ে আসছি।

অম্রুর সঙ্গে ভেঞ্জুও এসে জোটে মালুচাচার ক্ষেতিতে। মালুচাচা দারুণ খুশী। এসময় ধান তোলা হয়ে গেছে। সরসোন বুনতে হবে। তার আগে ভেড়্-বক্রির নাদিতে জবর সার জমে যাবে ক্ষেতিতে।

উঁচু পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে মাগ্‌গর (অগ্রহায়ণ) মাসে অম্রু নেমে এল একেবারে নীচের পাহাড়ে। এসব পাহাড়কে গদ্দীরা বলে ব্যান। এই ব্যান অঞ্চলগুলোতে যেন তাদের চারণের মৌরসী পাট্টা রয়েছে।

বিপাশা বইছে : নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে যেন ঝাঞ্জর (ঘুঙুর) বাজিয়ে চলেছে। পাশে পাহাড়ের গায়ে গায়ে ক্যায়ল (চীর পাইন) গাছের সারি। দূরে কাছে রূপোর কুচির মত বরফ সূর্যের আলোয় ঝলকাচ্ছে। সারা কুলু উপত্যকার ব্যান অঞ্চল জুড়ে চরে বেড়াচ্ছে হাজার হাজার ভেড়্-বক্রি। গাছের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ তাদের দেখা যাচ্ছে, আবার আড়ালে চলে যাচ্ছে। অলস মধ্যাহ্নে একটা ক্র্যা (পাইন) গাছে হেলান দিয়ে বসে অম্রু বাঁশুরী বাজাচ্ছে।

মাগ্‌গর মাসের মাঝামাঝি শুরু হয়ে গেল শীতের হাওয়া। বরফ ঝরতে লাগল ঝির ঝির করে। মাঝে মাঝে আকাশে জমে ওঠে মেঘ। কোন কোনদিন জোর বাতাস বইলে ক্র্যা গাছের বনে শুরু হয়ে যায় কান্না। অম্রু শীতের শুরুতেই একটা খবর পেল। কাংড়া থেকে গোপী কুলুতে এসেছে তার ভেড় নিয়ে। সে বেরিয়েছিল অম্রুর অনেক পরে। ঢাল ময়দানের কাছে দেখা হয়ে গেল গোপীর সঙ্গে অম্রুর।

উৎসুক হয়ে উঠল অম্রু, গোপী ভেইয়া, আমার ঘরের খবর আচ্ছা তো ?

গোপীকে বিষণ্ণ দেখাল।

উদ্বেগে গলা কেঁপে উঠল অম্রুর, ঘুঙরীর তবিয়ৎ ক্যায়সে ?

গোপী যা বলল তাতে বোঝা গেল, সে আসার সময় তার বউ-এর মুখে শুনেছিল, ঘুঙরী নাকি প্রসব-বেদনায় বেশ কষ্ট পাচ্ছে। চলে আসতে হল, তাই সে জেনে আসতে পারেনি শেষমেশ কি হল।

অম্রুর মাথার ওপর তখন আকাশভাঙা মেঘ জমে উঠেছে। মুহূর্তে সে তার কর্তব্য ঠিক করে ফেলল। গোপীকে কিছু না বলে অম্রু হ্যালা হুঁই, হ্যালা হুঁই করতে করতে তার ভেড়-বক্‌রির দল চালিয়ে নিয়ে চলল কাংড়ার পথে।

পাঁচদিনে ভুবু জোৎ পেরিয়ে প্রায় উড়ে চলে গেল অম্রু। সারাক্ষণ মনের ভেতর দুশ্চিন্তা, ঘুঙরী ভাল আছে তো।

পথ চলতে প্রার্থনা করে, হে বাবা মহাদেও, রক্ষা কর আমার ঘুঙরীকে। তার যেন কোন বিপদ না ঘটে।

একেবারে সন্ধ্যার মুখে ভেড়্-বক্‌রির পাল নিয়ে মাতুল পারষোত্তমের ডেরার বাইরে এসে দাঁড়াল অম্রু। শীতের কামড় শুরু হয়েছে, তাই সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে ওঠার আগেই যে যার ডেরায় আগুনের ধারে এসে সিঁধিয়েছে।

বুকের ভেতর গুর্‌গুর্ করে উঠল অম্রুর। শ্মশানের মত শূন্য মনে হচ্ছে চারদিক। অম্রু দুম্‌সারামকে ডাকার চেষ্টা করল কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না।

হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ একটা কান্নার শব্দ শীতের হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের গলার আদরের স্বর। অম্রু চীৎকার করে দুম্‌সারামের নাম ধরে ডাকতে লাগল। একসময় মণিমহেশের (পবিত্র পর্বত ও দেবতা) উদ্দেশ্যে দুটো হাত জোড় করে বলল, প্রভু তোমার কৃপায় আমি আজ আমার ঘুঙরীকে ফিরে পেলাম।

আলো হাতে পারষোত্তমের সঙ্গে দুম্‌সারাম বেরিয়ে এল। বাইরের আগল খুলে যেতেই পারষোত্তমকে প্রণাম করল অম্রু।

অবাক হয়ে গেছে পারষোত্তম।

অম্রু, তুই!

হাঁ মামাজী।

পারষোত্তম অমনি অম্রুকে জড়িয়ে ধরে বলল, বেটা হয়েছে রে, বেটা। চল্ বেটা, অন্দর চল্।

অম্রু হঠাৎ কেমন লজ্জা পেয়ে গেল। সে বলল, আমি ওরিতে (ভেড়-বক্‌রিদের থাকার জায়গা) ভেড়-বক্‌রিগুলোকে ঢোকাবার ব্যবস্থা করি। তুম্‌সা আমার সঙ্গে আয়।

পারষোত্তম অম্রুর আসার খবরটা চড়া গলায় হাঁকতে হাঁকতে অন্দরে পৌছে দিল।

রাতে অম্রুকে কাছে পেয়ে ঘুঙরী বলল, বহুৎ কষ্ট পেয়েছিলাম, মালুম হয়েছিল আর তোমাকে দেখতে পাবনা। দিনভর কষ্ট দিয়ে শেষমেশ রাতে বেটা জনম নিল।

গোপীর মুখ থেকে তোমার কষ্টের কথা শুনে আমার মাথাটা বেঠিক হয়ে গেল। আমি ছুট লাগালাম। পথে পাঁচরোজ কেমন করে কাটল তা মহাদেও জানেন।

অম্রুর একখানা হাত বুকের ভেতর টেনে নিয়ে ঘুঙরী চেপে ধরল। তার আপনার জনকে সে কাছে পেয়েছে এই আশ্বাসে তার দিলটা ভরে উঠল।

একসময় ঘুঙরী অন্ধকারে অম্রুর মুখখানা হাত দিয়ে ছুঁয়ে বলল, সত্যি বল, কেমন হয়েছে বেটা?

বহুৎ সুন্দর। একদম মা য্যায়সা।

না, বিলকুল তোমার মুখড়া।

মনে মনে ভারি খুশী হল অম্রু। তবু মুখে বলল, আদল তো ভাঙবে গড়বে। শেষমেশ কি দাঁড়াবে, এখন বলা মুশকিল।

তুমি পুরা হাইউন্দ্ (শীতকাল) এখানে থাকবে তো?

অম্রু অমনি বলল, তুমি না তাড়ালে যাবনা।

অভিমান করে কতক্ষণ মুখ ফিরিয়ে রইল ঘুঙরী। অমৃরু সাধ্য-সাধনা করতে লাগল।

আমি বুঝি তোমাকে শুধু তাড়িয়ে দি?

কথার কথা, তাই বলেছি।

এবার থেকে এখানে থাক, না হয় সরলে (সরল উপত্যকায়)। ক্ষেতির কামকাজ চালাও। সহজে খানাপিনার যোগাড় হয়ে যাবে।

অমৃরু জানে এটা ঘুঙরীর ইচ্ছার বিপরীত কথা। সে শুধু অমৃরুকে আঘাত দেবার জন্যেই কথাগুলো বলছে। ঘুঙরী খোঁড়া। দুনিয়া তার চলার পথে হাজারটা বাধা ছড়িয়ে রেখেছে। তবু ঘুঙরী চলবেই চলবে। সে বিধাতার দেওয়া বাধাকে মানবেনা। পথে পথে সে যত বাধা ডিঙোবে, তত তার আনন্দ উপচে উঠবে। তার বুড়ো বাবা পথ চলাকেই ধর্ম বলে মেনেছে। তার মেয়েও বাপের ধর্মকেই পালন করে চলেছে।

ঘুঙরীর কথার উত্তরে অমৃরু কপট রাগ দেখিয়ে বলে, আমি যদি সুখের লালচে (লোভ) পড়ে থাকতাম—তাহলে সাত আট মাহিনা পাহাড় ঢুঁড়ে ফিরতাম না।

ঘুঙরী আর কথার পিঠে কথা বাড়ায় না। মানুষটাকে সে ভাল করেই চেনে। কত কষ্ট করে জোৎ (পাশ) পেরিয়ে লোকটা আপদের কথা শুনে ছুটে এসেছে। গভীর মমতায় সে অমৃরুর পায়ে হাত ঘষতে ঘষতে বলে, তড়িঘড়ি আসতে গিয়ে পায়ে বহুৎ দরদ হয়েছে, নাগো?

অমৃরু অমনি বলে, ও কিছু না। তোমার তবিয়ৎ বিলকুল ঠিক আছে দেখে আমি খুশী।

তবুও ঘুঙরী বিছানা ছেড়ে উঠে যায়।

কোথায় যাচ্ছ?

কোন উত্তর না দিয়েই ঘুঙরী রসুইখানার দিকে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চলে যায়। বাতি জ্বালার আওয়াজ ওঠে। মিটমিটে একটা আলো রসুই ঘর থেকে শোবার ঘরের চৌকাঠে উঁকি মারে। জড়িবুটি

মেশান একটা তেল ঘুঙরী তৈরী করে রেখেছে। চলার পথে পায়ে দরদ হলে ঐ তেল মালিশ করলেই ব্যথার উপশম। ঘুঙরীর বাবাই এটা তাকে তৈরী করতে শিখিয়েছিল।

তেলটা গরম করে শোবার ঘরে নিয়ে এল ঘুঙরী।

বাতিটা ঘরের এককোণে রেখে বিছানার কাছে এগিয়ে এল।

ততক্ষণে অম্রু বিছানার ওপর উঠে বসেছে।

বলেছি তো পায়ে কিছু দরদ নেই।

ঘুঙরী শুধু বলল, কৃপা করে শুয়ে পড়।

ঘুঙরীর এই নরম অনুরোধটুকুর ভেতর এমন একটা জোর ছিল যা অম্রু এড়াতে পারলনা। বাধ্য ছেলের মত বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কতক্ষণ তেলটুকু অম্রুর দুটো পায়ে মালিশ করে দিতে লাগল ঘুঙরী। মালিশের সঙ্গে সঙ্গে মিশে যেতে লাগল ঘুঙরীর মনের মমতা। এ মমতাটুকু মেয়েদের মনের অদ্ভুত এক মধু। ঘুঙরী তার বুড়ো বাবাকে, তার সদ্যজাত শিশুকে এই মমতার মধু খাইয়ে তৃপ্তি দিয়েছে। এখন স্বামীর সেবাতেও মমতার সেই মধু ঢেলে দিচ্ছে।

অম্রু কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ একটা কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুঙরী ইতিমধ্যে উঠে বসে ছেলেকে বুকে টেনে নিয়েছে। চুক্ চুক্ করে মায়ের ভরা দুধ টেনে টেনে খেতে লেগেছে শিশুটি।

অমরু বলল, বেটার ভুখ্ লেগেছে বুঝি?

ঘুঙরী বলল, কেঁদে তোমাকে ওঠাল তো?

অন্ধকারে হাত বাড়ায় অম্রু। ছেলের গায়ে, মায়ের খোলা বুকে হাত লাগে।

ঘুঙরীর গলায় চাপা প্রতিবাদ, কি হচ্ছে ওটা?

হাত সরিয়ে নেয় অম্রু।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। শিশুর পিঠে মায়ের ঘুম পাড়ানি চাপড়ের শব্দ। তারপর অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকা অম্রুর কোলে এসে

পড়ল একটা আটার তাল।

ঘুঙরী কি অন্ধকারে দেখতে পায়! ঠিক ছেলেটাকে তাক্ করে ফেলে দিয়েছে বাপের কোলে।

অম্রু কোল নাচিয়ে ছেলেকে আদর জানায়। নরম উলের পাট্টুতে (কম্বল) ছেলের গা মোড়া। টুস্টুসে আপেলের মত মুখখানা খোলা।

অম্রু সাবধানে ছেলের গালে হাতের ছোঁয়া লাগাল। কচি মাথায় হাত বুলিয়ে দেখল উর্পুর (পুরুষ মেষশাবক) মত নরম লোম গজিয়েছে।

মায়ের সাড়া নেই। বাচ্চা ঠিক বোঝে। উত্তাপের হেরফের হলেই বোঝে, ঠিক জায়গাটিতে নেই। অমনি নড়ন চড়ন শুরু হল তার সঙ্গে সশব্দে প্রতিবাদ।

ঘুঙরী ছেলেকে বাপের কোল থেকে তুলে নিতে নিতে বলে, বাপ হয়েছ, লেড়কা সামলাতে পার না?

অম্রু বলে, তোমরা সব যাদু জান। হাত ছোঁয়ালেই লেড়কা চুপ

ঘুঙরী মন্তব্য করে, তোমার তেমন লেড়কা কিনা! ওসব আদর-ফাদর বোঝেনা। একটু অসুবিধে হলেই গলা ফাটিয়ে বাড়ী মাথা করবে।

অম্রু বলে, বড় হলে দেখো, বেটা একদম ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ঘুঙরী অমনি বলে ওঠে, ঐ আশা নিয়েই থাক। বড় হয়ে কে কি চেহারা নেবে, সে কেবল ছোড়্লেবালাই (কালা) জানতে পারে

জন্মের পনের রোজ বাদ অম্রুর লেড়কাকে নিয়ে ববরু (পুর মত খাবার) খাওয়ানোর উৎসব হয়ে গিয়েছিল। পারষোত্তম পরে দিন সকালে ভাগ্নেকে পাশে বসিয়ে সবিস্তারে শোনাচ্ছিল সে উৎসবের সমারোহের কথা। ঘুঙরী কিন্তু সারারাত আপন মানুষ কাছে পেয়েও উৎসবের ঘটাপটার কোন কথাই বলেনি। চিরদি

সে একটু চাপা স্বভাবের মেয়ে। দরিদ্র বাবার কাছে থেকে দারিদ্র্য আর সম্মান দুটোকে পাশাপাশি রেখেই সে চলতে শিখেছিল। তাই কোন কিছুতেই উচ্ছ্বসিত হবার স্বভাব ছিলনা তার।

পারষোত্তম পয়সাওলা মানুষ। সে পাটোয়ারী (মৌজার সরকারী খাজনা আদায়কারী)। তাকে খাতির করেনা, তল্লাটে এমন কেউ নেই। ব্রাহ্মণ, ক্ষেত্রি, ঠাকুর—সব্বাই তার কোঠিতে এসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে গেছে।

মহাজন উধম সিং একটা সোনেকা মোহর দিয়ে গেছে নবজাতককে।

পারষোত্তম খালি ববরু খাওয়ায়নি নিমন্ত্রিতদের। ভাত, দাল, সব্জি, লাড্ডু, জিলাবি—সবকুছ খাইয়েছে পেটভরে। সব্বাই খুশী হয়ে আশীর্বাদ করে গেছে অম্রুর লেড়কাকে।

খালি আসেনি একটা লোক। রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে বলল পারষোত্তম, ঐ পুরানো জমিন্‌দারের রাখোরার (রক্ষিতা) চৌকাণ্ডুটা (বিধবার অবৈধ সন্তান)। জমিনদার মরার আগে ঐ চৌকাণ্ডুটাকে বহুৎ রুপেয়া দিয়ে গিয়েছিল। বেটা সব খুইয়ে বসে আছে। ওর মা বেটী তোর মামী জিন্দা থাকতে বহুৎ দফে এ বাড়ী এসেছে। তাই শালেকো চৌকাণ্ডু জেনেও ডাকলাম। মালুম, মাথা কাটা যাবে বলে শালে আসলনা।

অম্রু বলল, ঠিক আছে মামা, যার খুশি আসবে, যার খুশি আসবে না। এতে ভাবনার কিছু নেই।

পারষোত্তম অম্রুর সমাধানের ধারকাছ দিয়েও গেলনা। সে তখন রাগে ফুঁসছে।

চার-চার বরষ খাজনা বাকী পড়েছে। ও বেটাকে ভিটা থেকে তুলব, তবে আমার নাম পারষোত্তম, হাঁ।

অম্রু কথাটা ঘোরাতে চাইল, মামা, তুমি ধনসুদের (ঢাকী) ডেকেছিলে?

ডাকব না? ওরাই তো বাজনা বাজালরে।

ভাল করে খাইয়েছ তো ওদের?

পারষোত্তম হা হা করে হেসে হাতদুটো ফাঁক করে দেখালেন, এই এ্যাতো। খালি চাউল (ভাত) আর দাল উড়িয়ে গেল। ভাগ্যিস রুরা ধানের (তৃতীয় শ্রেণীর মোটা ধান) চাউল তৈয়ার ছিল ফুটিয়ে দেওয়া হল। বললাম, পেট ভর খা।

অম্রু উঠোনে ধানের গাদার দিকে হাত দেখিয়ে বলল, কি ধান মামা?

ওটা হল পরদেশী (উৎকৃষ্ট ধান)। ডাইনে যে গাদা দেখছিস, ওটা মহুরী (দ্বিতীয় শ্রেণীর ধান)। বাঁয়ে সত্তু, কটারী (মোটা ধান)।

অম্রু বলে, পরদেশী তো সবচেয়ে সেরা জাতের ধান, তাহলে অন্য সব ধানের চাষ না করে খালি পরদেশীর চাষ করলেই হয়।

হাসল পারষোত্তম, তুই হলি পহালের (ভেড় বকৃরি চরায় যারা) বেটা পহাল। তুই চাষের কি বুঝবি?

একটু থেমে বলল, ঐ মোটা ধানগুলোর ফলন বেশী। ওগুলো ওজনে ভারী। কাজের লোকেরা ঐ চাউল খেলে বহুৎ সময় পেটভরা থাকবে। আর ঐ ভাল চাউল রান্না করে খাওয়াও, হালকা পেটে বেটাদের খালি ভুখ্ লাগবে। কামকাজে একদম মন লাগবেনা।

অম্রু সব শুনে বলল, আমার পহালগিরিই ভাল মামা। এতসব ভাবনার কিছু নেই।

পারষোত্তম উদাসীন গলায় বলল, এতসব তাহলে কার জন্য করছি বেটা। শেষমেষ তোকেই তো এসব বুঝে নিতে হবে।

মামার কথায় দুঃখের আঁচ পেয়ে অম্রু ঐ প্রসঙ্গে ইতি টেনে দেবার জন্য বলল, যতদিন জিন্দা আছ ততদিন তো দেখ। তারপর একটা কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

সকালে নোহরি (হাল্‌কা প্রাতঃরাশ) সেরে পথে ঘুরতে বেরুল অম্‌রু। আজ ডুম্‌সারামই তার ভেড়বক্‌রি আগলাবে, সে শুধু ঘুরে বেড়াবে তার পরিচিত পথে।

কোঠি থেকে বেরিয়েই সে পা চালাল অনন্তরামের ডেরার দিকে। মামা যতই গালমন্দ করুক, অনন্তরামকে সে ছেলেবেলা থেকেই চেনে। কত খেলকুদ করেছে একসঙ্গে। রোজ মহল্লার ছেলেদের নিয়ে ওরা লুকলুকানি (লুকোচুরি) খেলত। ছোটবেলা ঐ খেলাটা একবারে মাতিয়ে তুলত ওদের।

অনন্তরাম ঘরে আছ?

দু' চারবার হাঁকডাকের পর বেরিয়ে এল অনন্তরাম।

এতখানি জীর্ণ হয়ে পড়েছে অনন্তরাম তা জানতে পারেনি অম্‌রু। কতদিন পরে দেখা। ভারি কষ্ট হল অম্‌রুর।

মালিকের মত শীর্ণ আর শ্রীহীন হয়ে গেছে কোঠিখানা। এক-পাশের দেয়াল ধসে পড়ার দাখিল।

কাকে চাই?

আরে দোস্ত, আমাকে চিনতে পারলেনা।

অনন্তরামের কোটরে ঢোকা চোখদুটো নিবিষ্ট হল।

অম্‌রু! আও দোস্ত্‌, আও।

অনন্তরাম নিজেই নেমে এসে অম্‌রুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেল তার ঘরের ভেতর।

চারপাইএর ওপর বিস্তারা পাতা। অনন্তরাম বিছানার ওপরে খিন্দখানা (পুরনো কাপড়ে তৈরী কাঁথা) একটু টেনেটুনে ঠিকঠাক করে অম্‌রুকে বসাল। পাশেই কাঠের একটা জলচৌকিতে খলনুড়ি, মধুর শিশি আর কবরেজী দাওয়াই রাখা।

অমরু চারপাইএর ওপর বসে। তাকে দেখতে লাগল অনন্তরাম।

কি দেখছ দোস্ত?

এক চিলতে হাসির রেখা ফুটে উঠল অনন্তরামের মুখে।

দেখছি চৌদ্দ বরষ আগের দোস্ত অম্রুকে।

অম্রু অনন্তরামের হাত ধরে টেনে নিজের পাশটিতে বসাল। বলল, পিতাজীর সঙ্গে সেই যে চলে গিয়েছিলাম চম্বায় তারপর দু' এক রোজ এসেছি এখানে। তাই ছেলেবেলার দোস্ত্‌দের সঙ্গে দেখাই হয় নি।

অনন্তরাম বলল, তোমার পিতাজী জিন্দা নেই শুনেছি।

ঠিকই শুনেছ। তোমার পিতাজীর দেহান্ত হয়েছিল শুনেছি, কিন্তু মাতাজী কি জিন্দা আছেন?

হাঁ, তবে এ কোঠিতে নেই। বজ্রেশ্বরী মন্দিরের কাছে পিতাজীর একটা কোঠি ছিল। আমার বহিন পিনঝিকে ওটা সাদিতে যৌতুক দিয়েছিল। সেখানে মা আছে। রোজ মন্দিরে বজ্রেশ্বরী দর্শন হচ্ছে।

একটা বছর পাঁচেকের ছোট্ট মেয়ে ভেতরের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে অনন্তরামকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল।

অম্রু বলল, তোমার লেড়কি?

হেসে মাথা নাড়ল অনন্তরাম।

অম্রু উঠে গিয়ে অনন্তরামের মেয়েটিকে ধরতে যেতেই সে খিল খিল শব্দে হাসি ছড়িয়ে ছুটে পালাল।

অনন্তরাম বলল, বস, আসছি।

কিছুক্ষণ পরে একটা ছোট মাজা থালায় অনন্তরামের মেয়েটি চারখানা পুরী আর একটা মেঠাই নিয়ে টুক্‌টুক্ করে পা ফেলে ফেলে এল। পেছনে অনন্তরামের হাতে জলের গেলাস।

হাত কাঁপছে দেখ, তবু চাচাজীর জন্যে নিজের হাতে খাবার আনবে।

অম্রু হাত থেকে থালাখানা ধরে নিয়ে মেঠাইটা ভেঙে অনন্তরামের মেয়ের মুখে পুরে দিতে গেল। ঠিক তেমনি হাসি ছড়িয়ে অন্দরের দিকে ছুট লাগাল মেয়েটি।

আবার গুটি গুটি পায়ে ঘরে ঢুকল আর একখানা থালা নিয়ে।

এ থালাখানা অনন্তরামের।

এবার মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করল অম্রুরু। অনেক সাধ্য সাধনা করে মেঠাইএর ভাঙা অংশটুকু খাওয়াতে পারল।

মেয়েটিকে কোলে নেওয়ামাত্র অম্রুরুর বুকের ভেতর স্নেহ উথলে উঠল।

ছু' বন্ধুতে গল্প হল অনেক। বেশীটা ছেলেবেলার গল্প। হারানো দিনগুলোকে যেন তারা ফিরে ফিরে পেতে লাগল।

দতিয়ালুর (মধ্যাহ্ন ভোজ) সময় না হওয়া অব্দি ছু'দোস্ত্ বসে বসে খালি গল্পই করে গেল। মাঝে মাঝে নতুন অতিথিকে পাক দিয়ে আপন মনে ঘুরে যেতে লাগল অনন্তরামের কচি মেয়েটি।

ফি:র আসার সময় অম্রুকে উঠোনে দাঁড় করিয়ে কোঠির ভেতর ঢুকে গেল অনন্তরাম। কিছু পরে বেরিয়ে এসে বলল, চল, তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দি।

কিছু পথ এসে একটা পাণ্ডাড় গাছের নীচে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল অনন্তরাম। অম্রুরুর হাতখানা ধরে বলল, তোমার বেটার মঙ্গল অনুষ্ঠানে যেতে পারিনি দোস্ত্। তুমি তার চাচীর এই সামান্য আশীর্বাদটুকু নিয়ে গেলে বহুৎ খুশী হব।

একটা রঙীন কাপড়ের টুকরায় বাঁধা কোন একটা জিনিস অম্রুরুর হাতে ধরিয়ে দিল অনন্তরাম।

অম্রুরু বলল, কিন্তু তুমি আপনা হাতে দিলে পারতে দোস্ত।

ম্লান হাসি অনন্তরামের মুখে। বলল, দিন ফিরলে নিশ্চয়ই একদিন যাব তোমার বাহাদুর লেড়কাকে দেখতে।

অম্রুরু অনন্তরামের সাংসারিক ছুঃখ দুর্দশাকে আর খুঁচিয়ে জানতে চাইল না।

কোঠিতে ফিরে পারষোত্তমকে কিছু বলল না অম্রুরু। মামাজী বেরিয়ে গেলে ঘুঙরীকে ডেকে বলল, আমি অনন্তরামের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

মামাজী জানলে বহুৎ গুস্‌সা করবে।

মামাজী জানে না, জানবেও না! আরে এই নাও, তোমার লেড়কার জন্যে অনন্তরামের বহু কি একটা বেঁধে দিয়েছে।

ঘুঙরী অম্‌রুর সামনে রঙীন কাপড়ের গিঁটটা খুলে ফেলতেই একজোড়া পাঞ্জেব (মল) বেরিয়ে পড়ল। কচি পায়ের চাঁদির পাঞ্জেব।

ঘুঙরীর চোখে বিস্ময়। বলল, বহুৎ দামী চিজ তোমার ভাবী পাঠিয়েছে।

অম্‌রুর মুখে তখন কথা সরছিল না। তার মনের ভেতর তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। এইমাত্র সে এই পাঞ্জেব জোড়াটি অনন্তরামের কচি মেয়েটিকে পরে ঘুরতে দেখেছিল। সে ঘুঙরীকে কিছু না বলে শুধু মাথা নাড়ল।

দিনভর অম্‌রু কেবল ঐ পাঞ্জেব জোড়ার কথাই ভেবেছে। আহা, কচি মেয়েটার পা থেকে খুলে নিয়ে তার হাতে সেটা তুলে দিতে অনন্তরামের হাত একটুও কাঁপল না। অনন্তরামের বহুর ও নিশ্চয় যোগ ছিল সে ব্যাপারে।

একবার অম্‌রুর মনে হল, সে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে ঐ পাঞ্জেব। আবার ভাবল, ওটা ফিরিয়ে না দিয়ে দামী কোন জিনিস ওর মেয়েকে দিয়ে আসবে। কিন্তু শেষ অব্দি দুটোর কোনটা করতেই তার মন চাইল না। অনন্তরামের এত বড় দান তাহলে ছোট হয়ে যাবে।

অম্‌রু পরে অনেকের মুখেই শুনেছে, অনন্তরাম সবার বিপদে বুক দিয়ে পড়তে গিয়েই নিজের সবকিছু খুইয়েছে। তবে জমিদারের রক্ত আছে গায়, তাই কষ্টের ভেতরেও কারু কাছে শির ঝোঁকায়নি।

সারা শীত ভেড় বক্‌রিগুলো ঘাস পায় না। বিল, কাংগু, কেম্বল, খইর গাছের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। তুম্‌নারাম কখনো পাতাপত্র সমেত গাছের ডাল ভেঙে আনে। ওব্রির (ভেড় বক্‌রির আস্তানা)

সামনে ফেলে দিলে ভেড় বক্‌রিগুলো হুড়মুড়িয়ে ছুটে আসে খেতে। বক্‌রিগুলো ঠেলেঠুলে হাঁই হাঁই করে খায়। হুম্‌সারাম ভেড় আর বক্‌রিকে দু'দলে ভাগ করে দেয়। বুড়ো মানুষ গোদাগুলোকে ঠেলে সরাতে হিমসিম খেয়ে যায়।

দূরে কাছে পাহাড়ে বরফ পড়ে। হিম শীতল হাওয়া তেড়ে তেড়ে আসে। কোঠির ভেতর চিড় চিড় শব্দে কাঠ পোড়ে। ঘুঙরী আগুনে হাতটা সেঁকে নিয়ে বাচ্চার গায়ে গরম হাতখানা বুলোতে থাকে। পারষোত্তম খাজনা আদায়ের অথবা জমি জায়গা তদারকির কাজে বেরুলে অম্‌রু রসুইখানাতে ঘুঙরীর পাশে এসে বসে। বাচ্চার গালে আলতো করে টুস্‌কি দেয়। মেরা লাল, মেরা লাল বলে আদর জানায়।

ঘুঙরী বলে, তোমার বেটা ভেড়কে বহুৎ পেয়ার করবে।

কি করে বুঝলে ?

হুম্‌সারামের ঠেলা খেয়ে একটা ভেড় শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছিল; অমনি গর্দান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেটাকে বহুৎ সময় দেখল।

অম্‌রু খুশী হয়ে বলল, সাবাস, সাবাস, বাপকা বেটা।

সারা শীতকাল কাংড়াতে রইল অম্‌রু। মামাজীর গমের ক্ষেত শীতের বৃষ্টিতে ঝলমল করে উঠল। সরশোনের হলুদ ক্ষেত পথচারীর চোখ কেড়ে নিল।

এ সময় পারষোত্তম নিজের ক্ষেত তদারকি করে বেড়াল। অম্‌রুকে মাঝেমাঝে টেনে নিয়ে গেল সঙ্গে।

দেখ বেটা, গেঁহু কি রকম ফলেছে।

হাঁ মামাজী।

হঠাৎ পারষোত্তম হয়ত হেঁকে উঠল, হাঁরে হাও, সকাল থেকে খালি ছিলম (কল্কে) টেনে যাচ্ছিস ? সারা ক্ষেতে আলু বসিয়ে তবে খানা খেতে আসবি।

হাগুর হাত থেকে ছিলমটা ক্ষেতের মাঝেই ছিটকে পড়ল। সে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, জী হুজুর।

হাগু শীতের কামড়ে না পারষোত্তমের ধমক খেয়ে কেঁপে উঠল তা বোঝা গেলনা।

অম্রুর বড় কষ্ট হয় এদের জন্য। এরা বাপ ঠাকুদ্দার আমল থেকে মালিকের জমিতে বেগার খাটে পেট ভাতায়। বিয়ে করে এরা নতুন বউকে ঝাঁপানে চড়িয়ে আনতে পারবেনা। পায়ে হাঁটিয়ে আনতে হবে। সোনার কোন গায়না আদপেই পরা চলবেনা। বড় জাতের ব্যবহার করা পাণিহার থেকে কখনও ভুলে জল তুলতে গেলে কঠিন সাজা পেতে হবে।

মামার ক্ষেতির কাজকাম দেখে একাই ফিরে এল অম্রু। উঠোনে একরাশ ভেড়ার লোম চাঁই করা। কোক্‌ড়িতে (তক্‌লি) পশমী কাত্‌না (সুতো, উল) পাকাচ্ছে ঘুঙরী।

অম্রু পাশে এসে দাঁড়াল। ঘুঙরীর কোক্‌ড়ি সমানে ঘুরে চলেছে।

অম্রু বলল, মনে হচ্ছে চম্বিয়াল (চম্বার ব্যবসায়ী) এসে পড়ল বলে। আরও কত পশম পাকিয়ে তুলতে এখনও বাকী ?

ঘুঙরী মুখ তুলে বলল, ফাগুনের মাঝামাঝি যে পশম ছাঁটা হয়েছিল, সেটার প্রায় সবটা কাটা হয়ে গেছে। এখন কাতি মাহিনার পশম পাকাচ্ছি। ওপরের পাহাড় থেকে ফিরে এসে ভেড়গুলো প্রচুর লোম দেয় ঠিক, তবে এ সময়ের লোমে ফাগুনের সেই নরম ভাবটা একেবারে নেই। যতটা খাটছি ততটা দাম পাবনা।

অম্রু অমনি ঘুঙরীকে জড়িয়ে ধরে বলল, কেউ না দিক আমি দেব। দামের সঙ্গে সোনার একখানা দদমালা। মানাবে খাসা।

হঠাৎ ভেতরে কেঁদে উঠল বাচ্চাটা। অম্রুর বাঁধন ছাড়িয়ে পড়ি কি মরি করে অন্দরে ছুটল ঘুঙরী।

ফি বরষ পারষোত্তমের কোঠিতে জমজমাট লোড়ির (শীতে দারু পানের উৎসব) আসর বসে। শীতের এই লোড়ি উৎসবে মহল্লার প্রায় সবাই এর ডাক পড়ে। মেয়েরাও বাদ যায় না।

ঘুঙরী এবার লোড়ির জন্যে দারু তৈরী করে রেখেছে। কোদোর (জংলী ধান) রুটিতে ঢালি (একরকম তরল পদার্থ) ঢেলে মাটির বড় কয়েকটা পাত্রে ঢাকা দিয়ে রেখেছিল সে। এখন সেই তৈরী মদের নিমন্ত্রণে ভীড় করে এসেছে সবাই। পুরুষরা বসেছে বাইরের দালানে। মেয়েরা অন্দরে ঘুঙরীর ঘরে। দারু আর খাবার বাইরে দিয়ে আসছে ছুম্‌সারাম।

গণ্যমান্যদের সঙ্গে পারষোত্তম পানের আসর জমিয়ে বসেছে। গলা ফাটিয়ে হাসি আর পুরানো দিনের ঠাট্টা-মশকরা চলছে মুরুব্বিদের মধ্যে। অম্‌রু বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড়ালে বসে পানে মেতেছে। বন্ধুরা তারিফ করছে তার বউ এর হাতের তৈরী মদের। খাচ্ছে আর একটানা তারিফ করেই চলেছে।

ভেতরে মেয়েরা খাচ্ছে। নিজের হাতে ঢেলে ঢেলে দিচ্ছে ঘুঙরী। মেয়েরা গান জুড়েছে। বড় দুঃখের গান। আপনা আদমী কাছ ছাড়া হলে তার জন্য প্রাণের আকুল কান্না।

নদী রে কট্‌লা মন্‌রো তত্‌রু চাষে
জীনা রে রুষো সজনো
তীনে গি জীব্‌না বোলো কিসে।

নদীর ধারে থেকেও তিতির পাখী পিপাসায় কাতর হয়ে থাকে। বল, একজন নারী তার প্রিয়তমের কাছ থেকে এত দূরে থাকলে তার অবস্থাটা কিরকম হয়!

এবার একদল প্রশ্নের ভঙ্গীতে গেয়ে উঠল :

কুথুঁ তে উম্‌দি কালি বাদ্‌লি
কুথুঁ তে বরষিয়া থাণ্ডা নীর।

বল, বল, কোথা থেকে আসে কালো মেঘ, আর কোথা থেকেই বা

নামে বৃষ্টি ?

অন্যদল উত্তর দিল গানে :

দিলাঁ তে উম্‌দি কালি বাদ্‌লি
নৈনা তে বর্‌ষিয়া থাণ্ডা নীর।

হে আমার প্রিয়, ঐ কালো মেঘ উঠে আসে আমার বুকের ভেতর থেকে। আর বর্ষার ধারা নেমে আসে আমার এই দুটি চোখ বেয়ে।

অনেক রাত অব্দি লোড়ির হৈ হল্লা চলল। এবার আর অনন্তরামকে নিমন্ত্রণ করেনি পারষোত্তম। খাওয়া-দাওয়া চুকলে মহল্লার সবাই বিদায় নিল। পরস্পর হাত ধরাধরি করে নিজেদের সামলে সুমলে বাড়ীর পথে রওনা দিল।

অম্রু বহুকে বলল, তোমার হাতে তৈরী দারু আর খাবার আমাকে দিলে আমি চুপিচুপি অনন্তরামের কোঠিতে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।

ঘুঙরী অমনি বাধা দিয়ে বলল, তুমি ক্ষেপেছ। অনন্তরামজী জানে তাকে লোড়িতে ডাকা হয়নি, এখন দারু নিয়ে গেলে মানী লোকের মানে লাগবে না ?

অম্রু নিরস্ত হল। সে মনে মনে স্বীকার করল, তার চেয়ে ঘুঙরীর বিবেচনাবোধ অনেক বেশী।

এদিকে পেছনের দরজা খুলে কোথায় যেন বেরুল ঘুঙরী। অম্রু উঁকি দিল। আরে, এ যে খিড়কিতে কটা আদমী হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে বসে আছে। ছেঁড়া পাট্টুতে (কম্বল) গা আর মাথাগুলো ঢাকা।

ঘুঙরীর হাতের আলোতে অম্রু চিনতে পারল ওদের। অচ্ছুৎদের পাড়ার কটা লোক। লোড়ির খবর পেয়ে মামাজীর চোখ এড়িয়ে ওরির (ভেড়বক্‌রির আস্তানা) ধারে সিঁধিয়ে বসেছে।

গোপন জায়গাটা নিশ্চয়ই ঘুঙরী ওদের এক সময় দেখিয়ে দিয়ে গেছে।

মাটির হাঁড়িতে মদ আর খাবার এনে লোকগুলোর হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল ঘুঙরী।

আড়াল থেকে অম্রু দেখল, কৃতজ্ঞতায় ভেঙে পড়ছে লোকগুলো।

বসন্ত এল ফুলের বাহার নিয়ে। গাছের ডালগুলো ভরে গেল সাদা আর গোলাপী রঙের ফুলে। হাওয়ায় শীতের ধার নেই, শুধু আমেজ। কোয়েল, তোতা (টিয়ে), চটিপিন্‌ঝা (বুলবুলের মত ঝুঁটিওয়ালা পাখি) গাছের ডালে ডালে আসর জমাল।

পারষোত্তমের পাঁচিলের ধারে তগ্‌গর ফুলের (সুগন্ধ সাদা ফুল) গাছ থেকে ভুরভুরিয়ে গন্ধ ভেসে আসে। খাটনালুর (চায়ের মত ঝুপড়ি গাছ, বেলফুলের আকারে সুগন্ধ ফুল) গাছ কুঁড়িতে ভরে যায়। ঘরে পোষা মৌমাছিরা সারাদিন মধু সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যত কাজ তত গুনগুনিয়ে গান। ফুলের গাছগুলো সাদা ফুলের থোকায় সাজিয়ে তোলে নিজেদের।

গমের ক্ষেত এখন তৈরী। পাকা ফসল ঘরে তোলার জন্য ক্ষেতে নেমে পড়েছে কৃষকরা।

সারা শীতকাল বুন্‌নায় (তাঁত) গরম দু'খানা পাট্টু (কম্বল) তৈরী করেছে ঘুঙরী। পাঙ্গীর চারণে যাবার সময় সে অম্রুকে ঐ দু'খানা দিতে চায়।

ক'দিন মুখের কথা কমে এসেছে। এতটুকু বাচ্চাকে নিয়ে মামাজী ঘুঙরীকে চারণে কিছুতেই যেতে দেবে না। অম্রুরও মনের কথা তাই। তবে নিজের মনের ভাবটি মুখ ফুটে বলেনি ঘুঙরীকে। তাহলে তার ওপর মান করে ফুলে ফুলে কাঁদবে ঘুঙরী।

শিবরাত্রির পুজো শেষ হল। এখন গদ্দীরা ভেড়বক্‌রি নিয়ে ধৌলাধারের ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে উঠবে। তারপর এক সময় গাছপালার সীমারেখা ছাড়িয়ে জোৎ (পাশ) পেরিয়ে চলে যাবে পাঙ্গী, লাহুল, স্পিতি উপত্যকার দিকে।

ঘুঙরী আর বাচ্চাটাকে ছেড়ে যেতে মন কেমন করছিল অম্রুর। তউন্দি (গ্রীষ্ম) আর বরসাত্ (বর্ষা) কাটিয়ে সেই ভাদোনে (ভাদ্র) ফেরা। এদিকে চারণে যাবার জন্য ছটফট করছিল ছুটো পা। গদ্দী পহাল বন চিরে, নদীনালা পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে চলতে পারলেই খুশী।

হেলা হুঁই, হেলা হুঁই, কেরি, কেরি, কেরিগা। চল, চল, এগিয়ে চল। সিঙ্ক্ (চলার সংকেত বাঁশি) বেজে উঠল। কুত্তরের পাহারায় এগিয়ে চলল বাহিনী। একটি দুটি নয়, দলের পর দল।

পারষোত্তম অম্রুকে তার দলে বাওয়াল (ভাড়া করা মেষচারক) নিতে বলেছিল। অম্রু মামার কথা শোনেনি। শ'খানেক ভেড় বক্রি, এতে আবার বাওয়ালের কি দরকার। সে নিজেই মালিক, নিজেই পহাল আবার নিজেই বাওয়াল।

বনের পথে চলতে গাছের কাঁটা ফুটে যায় ভেড়-বক্রির পায়ে। খুঁড়িয়ে চললেই ধরা পড়ে যায় অম্রুর চোখে। তখন কোলের ওপর শুইয়ে কাঁটা তোলার পর্ব। ভ্যা ভ্যা, ব্যা ব্যা করে কান্না জুড়ে দেবে। ছটফট করতে গেলেই চাপড় খেতে হবে অম্রুর হাতের। তখন আর ছটফটানি নয় শুধু গলা ফাটিয়ে কান্না।

কাঁটা বের করে দিয়ে অম্রু জানোয়ারটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলবে, হুঁশিয়ার হয়ে পথ চলবি তো। আচ্ছা, তুই যে এমন করে চেঁচালি, ঠিক বলতো লেগেছে তোর ?

কোল থেকে ঠেলে দিয়ে বলবে, এখন চলে দেখ্, কত আরাম।

আরে কি হল তোর গলায় !

অম্রু ছুটে যায় একটা মাদী ভেড়ের দিকে। কিন্তু সহজে কি সে দেখাবে তার গলা। এদিক ওদিক ছুটতে থাকে। শেষে ধরা পড়ে চেঁচিয়ে মাৎ করতে চায়। এদিকে গলা ফোটে না।

অম্রু গলা টিপে টুপে দেখে। না, এতো গলঘটু (গলা ফুলে যায় যে রোগে) নয়। আরে এই তো পায়ে ঘা হয়েছে।

মুখখানা ফাঁক করে দেখে বলে, এই তো মুখেও ঘা। লাল লাল, ছড়া ছড়া। খড়েরু (মুখে পায়ে ঘা) বাঁধিয়ে বসে আছিস, তাই ঘাস পাতায় রুচি নেই।

ঠেলতে ঠেলতে তাকে দল থেকে নিজের জায়গায় নিয়ে আসে অম্‌রু। দড়ি দিয়ে একডেলা পাথরের সঙ্গে বেঁধে রেখে পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

নানান গাছ ঢু ড়ে ঢুঁড়ে শেষ পর্যন্ত বর্ন (ত্রিপত্রের গাছ। বেল-পাতার মত পাতা) গাছটি পাওয়া যায়। বেশ কয়েকটা পাতা তুলতে তুলতে চলতি একটা লোক-বচন আউড়ায় ঃ

জিত্‌ বর্ণ, বস্নুঁটি, বরেঁ
তিত্‌ মানু কিআঁ মরে।

যেখানে বর্ণ, বস্নুঁটি আর বরঁগাছ রয়েছে, সেখানে মানুষ আবার মরে কেন ?

এখন ফিরে এসে পাথরের ওপর পাতাগুলো রেখে আর একখানা পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে থেঁতো করে নেয়। তারপর বেটে নেয় মশলার মত নরম করে। কিছুটা জলের সঙ্গে খাইয়ে দিয়ে, বাকীটা থক্‌থকে করে পায়ের ঘায়ে লাগিয়ে দিয়ে রোদ্দুরে চেপে ধরে থাকে। ঐ ক্ষতস্থানটা শুকিয়ে গেলে তবে ছেড়ে দেয়। দু' তিন রোজ এমনি পর পর পরিচর্যায় ঘা শুকিয়ে যায়।

অম্‌রু এবার কি মনে করে তার চারণের পথটা বদলে নিয়েছে। সে সাচ জোৎ পেরিয়ে পাঙ্গী না গিয়ে ভারমৌর হয়ে কুগ্‌তি গিরি-পথে যাবে নতুন চারণভূমির দিকে। নতুন জায়গা আর নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হবে তার।

অম্‌রু তউন্দিতে (গ্রীষ্মে) ধরমশালা থেকে গজ জোৎ পেরিয়ে চৌলাধারে এল। এখানে ভেড় বক্‌রির দলটি ত্রোড় গাছের পাতা খেল পেটভরে। এরপর ঘাটোর, উরেই গ্রাঁ পেরিয়ে খাড়ামুখ ছুঁয়ে এল ভারমৌর গ্রাঁতে। পুরোনো দিনের একটি মন্দির ঘিরে ভেড়বক্‌রি

নিয়ে রাতের মত গোঠ বানাল।

আঁধার রাত। মণিমহেশের দিক থেকে বয়ে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া। কাঠের আগুনে গা-হাত সেঁকে নিচ্ছে অম্‌রু। চিড়্ চিড়্ করে কাঠ পুড়ছে। আগুন জ্বলছে ধিক্ ধিক্ করে।

সামনে একটি পহাল এসে দাঁড়াল। অম্‌রু খাতির করে পাশে বসাল তাকে।

তামাক সেজে ছিলমটা (কল্কে) নারেলির (হুঁকো) ওপর বসিয়ে নতুন অতিথির দিকে বাড়িয়ে দিল। এটাই এদের রীতি।

অম্‌রু বলল, গোঠ করেছ কোথায় ?

তোমার ডানদিকে খাসরু গাছের তলায়। দেখলাম, আগুন জ্বেলেছ তুমি, আলাপ করতে এলাম।

এ পথে ভেড়বক্‌রি নিয়ে এই প্রথম আসছি। তবে ভারমৌর আমার অচেনা নয়। তুমি কোথাকার বাসিন্দে ?

কিছু দূরে লাল গ্রাঁ। ওখানেই আমার বাপকেলে কোঠি। চারণের পথে মণিমহেশের মন্দিরে পুজো দিয়ে যাব, এই ইচ্ছে।

হু হু করে উঠল অম্‌রুর বুকখানা। যে ক্ষত শুকিয়ে গিয়েছিল, সেটা হঠাৎ খোঁচা লেগে দগ্‌দগে হয়ে উঠল।

হোলি গ্রাঁতে ছিল ধান্‌নির বাপের বাড়ী আর লাল গ্রাঁতে তার বিয়ে হবার খবর পেয়েছিল সে। আজ তাই মানুষটার মুখে লাল গ্রাঁয়ের নাম শুনে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

মুখে বলল, তা বেশ। কি নাম ভাই তোমার ?

দয়াল আমার পোশাকী নাম। সবাই ডাকে ঘাটারী বলে।

ঘাটারী, সে তো শালিক পাখি!

দয়াল মানুষটি হাসিখুশী আর বেশ সরল। বলল, ছেলেবেলা ঐ ঘাটারী পাখির মত বড় কিচির মিচির করতাম। তাই ঐ ঘাটারী নামটা কেউ সেঁটে দিল গায়ে। সেটা আর ঘষে তোলা যায়নি।

ধান্‌নি ফিরে ফিরে এল অম্‌রুর মনে। লাল গ্রাঁয়ের এই সহজ

সরল মানুষটিকে বোধ করি কিছু জিজ্ঞেস করা যায়। হয়ত ভাববেনা কিছুই।

এক সময় মনের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠলে সে বলল, আচ্ছা ধান্‌নি বলে কোন মেয়েকে তুমি চেন?

ঘাটারী বেশ জোরের সঙ্গে বলল, চিনব না! সে যে আমাদের ভাবীজী। আমাদের জ্ঞাতি ভাই নরসিংএর সঙ্গে সাদি হয়েছিল।

'সাদি হয়েছিল!' কথাটায় খটকা লাগল অম্‌রুর। বলল, কেমন আছে ওরা সবাই? আচ্ছা খবর তো?

আর থাকা। কেন, তুমি কি কিছু জাননা?

আমি ওর বাপের বাড়ার কাছেপিঠে এক সময় থাকতাম। বহুৎ রোজ ও তল্লাট ছেড়েছি।

আরে কি দুঃখের কথা, অমন পার্বতীর মতন রূপ, তার কিনা এক বরষও কাটল না, বিধবা হয়ে গেল।

সে কি! কি হল ওর আদমীর?

কি আবার হবে, তোমার আমার কপালে দোস্ত্‌, যে মরণ লিখা আছে তাই হল তার। হেন (তুষারপিণ্ড) নেমে এল হঠাৎ পুরো দলটার ওপর। চাপা পড়ে গেল সব।

গভীর দুঃখে কতক্ষণ কথা বলতে পারল না অম্‌রু। একসময় কিছুটা সামলে নিয়ে বলল, ধান্‌নি এখন কোথায়?

ভাবীজী এখন হোলি গ্রাঁয়ে তার পিতাজীর কোঠিতে রয়েছে। সাচ্‌ বাৎ বলব, এমন বহুর সাথে বনল না তার শাসের (শাশুড়ী)।

আর কোন কথা জিজ্ঞেস করার মত মনের অবস্থা ছিল না অম্‌রুর। সে আগুনের ধারে বসে কতক্ষণ শুধু অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল।

নারেলি টেনে উঠে দাঁড়াল ঘাটারী। বলল, যাচ্ছি দোস্ত্‌। তুমি খানাপিনা সেরে নিদ যাও। কাল তড়কায় (উষাকালে) একসাথ যাওয়া যাবে।

অম্‌রুর ঘোর কাটল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে তুমি

অম্রু বলে ডাকবে, আমিও তোমার নাম ধরে ডাকব। এ যাত্রায় আমরা দোস্ত্।

ঘাটারী মজার মানুষ। সে মন্তব্য করল, ঠিক আছে। এ যাত্রায় দোস্ত, ফিরতি যাত্রায় দুশমন।

পরক্ষণেই অম্রুকে জড়িয়ে ধরে হা হা করে হেসে উঠল।

পরের দিন ভোরবেলায় ভেড় বক্‌রি তাড়িয়ে নিয়ে ঘাটারীর সঙ্গে চড়াই পথে চলল অম্রু। এ সময় বর্ষার ধারার মত বহু ধারা এসে এক নদীতে মেশে। দলের পর দল চলতে থাকে একই সঙ্গে। প্রবল পাহাড়ী ঝোরার ফেনার মত সাদা ভেড় বক্‌রির দল স্রোতের মত চলেছে তো চলেছেই।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওঠার সময় গগ্‌গল (পাথর ভর্তি) রাস্তায় পড়লে পহালরা কেহলুবীরের (যে দেবতা পাহাড়ের ঢালে থাকেন) নাম করছে। বনের ভেতর দিয়ে যাবার সময় বিশেষ বিশেষ গাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানাচ্ছে। অরণ্যের আত্মা, বানবীর, রক্ষা করবেন তাদের। গভীর ভক্তিতে দ্রাট্‌খানা (কাস্তে) নিয়ে চলেছে সঙ্গে। ও তো দ্রাট্ নয়, দ্রাটের মূর্তি ধরে সাথ সাথ চলেছেন সাপের রাজা কৈলাং!

গাছের ডালপাতা থেকে ঝরে গেছে বরফ। পথের ওপর থেকেও সরে গেছে। শুধু দূরে কাছে পাহাড়ের ঢালে সাদা ছেঁড়া চাদরের মত বিছিয়ে আছে। আর বরফ জমে আছে চিরতুষার পর্বতের চূড়ায় চূড়ায়।

অম্রুরা কত ঝর্ণা ডিঙিয়ে, বন পেরিয়ে হাডসার, কুগ্‌তি গ্রাঁ ছুঁয়ে এগিয়ে চলল। ঘাসের জমিনে গোঠ বানাতে বানাতে উঠে গেল অনেক উঁচু বরফে ছাওয়া কুগ্‌তি লাতে (কুগ্‌তি গিরিপথ)। অম্রু দেখল সাচ্ জোতের চেয়েও এ গিরিপথ অনেক উঁচু। লা পেরিয়ে ল্যাসে (চড়াই, উৎরাইএর আগে পরের আস্তানা) বিশ্রাম। তারপর একেবারে গিয়ে পৌঁছল চারণভূমিতে।

নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ তবু চরিত্রে এক। সেই চোখ জুড়োনো ঘাসের জমিন। সেই তুষার পাহাড়। বৃষ্টি নেই। ঝকঝকে দিন। এখন নীচের উপত্যকায় অঝোরে নেমেছে বৃষ্টি। রুহনী চাষে (বীজ থেকে চারা বড় করে, পরে প্লাবিত জমিতে রোপণ করতে হয়) মেতেছে ঘিরথ (চাষী) সম্প্রদায়ের মেয়েরা। তারা সমস্বরে গান গাইতে গাইতে রোপণ করছে ধানের চারা। পাশ দিয়ে কেউ গেলেই খিল খিল হাসির সঙ্গে ছিটিয়ে দিচ্ছে ঘোলা জল। গাঁওকি আদমী ছুঁড়ে দিচ্ছে দু'চারটে সরস মন্তব্য।

নালা, কুহল, ছই উপচে উঠছে জলে। একবার মেঘের ডাক, গুড়কানার (বাজ) আওয়াজ উঠলে পাহাড়ে পাহাড়ে কতক্ষণ সেটা ঘুরে ঘুরে বাজছে।

ছোটবেলা মামার কাছে যখন ছিল তখন ধরমশালায় এই বারিষের দিনগুলো অমরুর কী যে ভাল লাগত! এখন তউন্দি (গ্রীষ্ম) আর বরসাতে (বর্ষাকাল) তাকে চলে আসতে হয় ভেড়বক্‌রি নিয়ে অনেক উঁচু পাহাড়ে। যেখানে বরসাতে বৃষ্টির ঘনঘটা নেই। আবার ওপরে শীতের তাড়া খেয়ে নামতে হয় নীচে সেই ভাদোন (ভাদ্র), আসুজে (আশ্বিন)। তখন নীচের পাহাড় আর উপত্যকাই ডেকে নেয় তাদের মত শত শত পহালকে।

আসার মাসের পূর্ণিমায় মেঘশূন্য আকাশের তলায় উৎসবের রঙ লাগে। নিজের হাতে কাণ্ডা থেকে ঘাস তুলে নিয়ে পহালরা ভেড়-বক্‌রিদের খাওয়ায়। পুজো করে কৃতজ্ঞতা জানায়।

কাঠ পুড়ছে। রান্নার ধোঁয়া উঠছে। কেউ রুটি সেঁকছে, কেউ বা শুধু বালি জলে গুলে ভোজন সমাধা করছে। ভেড় বক্‌রির অঢেল দুধ। চুঁই চুঁই করে দুইয়ে নিচ্ছে, ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেলছে।

অম্‌রু খাবার পরে রুবানাতে (বীণার মত তারযন্ত্র) সুর তুলেছে। খঞ্জরু (বাঁয়ার মত) বাজাচ্ছে খুরশী গ্রাঁয়ের একটা পহাল। ভারি

ভাল তালের হাত ওর। ওস্তাদ অম্‌রুর সঙ্গে সমানে ও বাজিয়ে গেল। রুবানা রেখে বাঁশুরীতে ফুঁ দিল অম্‌রু। অমনি যারা এতক্ষণ আধ শুয়ে অম্‌রুর রুবানা শুনছিল, তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল।

রাতে কখনও অন্ধকার গাঢ় হয়ে নামে, কখনও বা চানানির (চাঁদ) ফিন্‌কি ফোটা আলোয় ভেসে যায়। হু হু করে কনকনে বাতাস বয়ে আসে হিমালয়ের তুষার ছুঁয়ে। ঘাসের বিশাল প্রান্তর শিউরে ওঠে। দু'খানা পাট্টুতে মাথা অব্দি মুড়ে শুয়ে থাকে পহালরা। বেশী ঠাণ্ডা জাঁকালে ভেড়গুলোর ভেতর ঢুকে পড়ে ঠাণ্ডাকে ঠেকিয়ে রাখে।

ভোরের সূর্য প্রথমে সিঁদুর পরিয়ে দেয় তুষার পাহাড়ের মাথায়। মুখ থেকে পাট্টু সরিয়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে সিঁদুরের খেলা দেখে পহালরা।

একটু পরেই সোনার চাউঙ্ক (মাথার গয়না) মাথায় পরে, দদমালা (গলার হার) গলায় দুলিয়ে ঝলমল করে ওঠে তুষার পর্বত। ওরা উঠে দাঁড়িয়ে শির ঝুঁকিয়ে প্রণাম জানায়। কৈলাস, মণিমহেশ আর মহাদেওকে মনে মনে স্মরণ করে। এর পর শুরু হয় হররোজের কামকাজ।

আসার, শোয়ান, ভাদোন (আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র) উঁচু পাহাড়ে কাটিয়ে পহালরা নামতে থাকে নীচে।

অম্‌রু বলে, ঘাটারী, থেকে গেলে হয় না আরও কটা রোজ ?

তোমার খুশী আমারও খুশী দোস্ত।

ওরা দু'জনে এত বড় চারণক্ষেত্রে থেকে গেল আরও কয়েকটা দিন

অম্‌রুর মনে হল সে যেন তামাম এই ভূখণ্ডের বাদশা।

উঁচু পাহাড়ে শীতের হাওয়া বইতে শুরু করল, অমনি ওরা নামতে লাগল নীচে।

ঘাটারীকে বড় ভাল লেগে গিয়েছিল অম্‌রুর। যেমন সহজ তেমনি সরস।

অম্‌রু একদিন বলল, সাদি করনি কেন ঘাটারী ?

কি করে মালুম হল আমার সাদি হয় নি ? জেনানা সাদি করলে তার চিহ্ন থাকে, মরদানার (পুরুষ) তো কোন চিহ্ন থাকে না।

অম্‌রু বলে, সাদি আর হাঁচি চেপে রাখা যায় না দোস্ত্‌। সাড়ে তিন মাহিনা কাছাকাছি আছি, এক রোজও তোমার মুখে তোমার বহুর কথা শুনলাম না।

আরে ভাই আছে ?

কোথা ?

ঘাটারী বলল, সাদি হয় নি বলে কি আমার বহু থাকবে না ! নিশ্চয় সে কোই না কোই শ্বশুরের কোঠিতে আছে।

এবার অম্‌রু হেসে ঘাটারীর পিঠে চাপড় মেরে বলল, আমি তাকে এনে দেব। বাদশাজাদাকে ছুনিয়া ঢুঁড়ে আনব।

ঘাটারী কপাল দেখিয়ে বলল, কি ভাগ্য, পহালের কপালে বেহেস্তের হুরী ?

নামতে নামতে ছ'বন্ধুতে কথা হয়। ক্লান্ত হলেও কোন পাহাড়ী কুদে (গুহা) পিঠ ঠেকিয়ে বসে ছ'জনের দিকে ছজনে চেয়ে চেয়ে হাসে।

অম্‌রু বলে, একবার ভেড় বক্‌রি নিয়ে স্পিতি যেতে হবে।

ঘাটারী বলে, আমি যেন বাদ না পড়ি দোস্ত্‌।

আলবাৎ তুমি যাবে। আমার বহুও যাবে।

ভাবীজী ! এত উঁচু পাহাড়ে জেনানার যাবার তো রীতি নেই দোস্ত্‌।

আমার বহু ওসব কানুন থোড়াই মানে। ও জোয়ান পহালদের পিছু ফেলে পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যায়।

তুমি না বলেছিলে, ভাবীজী খোঁড়া।

অম্‌রু বলে, খোঁড়া তো কি আছে, ও তো শুধু পায়ে হাঁটে না, মনের জোর ওকে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়।

আবার কুগ্‌তি গ্রা। হাড়সার। শেষে ভারমৌরে সেই ভাঙা মন্দির ঘিরে আস্তানা।

পরের দিন দু'জনে আলাদা হয়ে যায়। আবার কোনদিন দেখা হওয়ার, একসঙ্গে চলার ইচ্ছা প্রকাশ করে তারা।

ঘাটারী চলে গেলে অম্‌রু তার দলবল নিয়ে চলতে শুরু করে। প্রথমে সে সরল উপত্যকায় যাবে, তারপর নামবে কাংড়ায়। না, সবার আগে সে একবার ঘুরে আসবে হোলি গ্রাঁ থেকে। একপলক ধান্‌নিকে চোখের দেখা দেখে আসবে সে।

যে বাউড়ির (পাহাড়ের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসা জলধারা) ধারে একদিন ধান্‌নির সঙ্গে তার দিল নিয়ে খেলা শুরু হয়েছিল, যেখানে সে তার আঁখ থেকে আঁসু ফেলে গিয়েছিল, সেখানে এক সাঁঝবেলা ভেড়বক্‌রি নিয়ে এসে পৌঁছল অম্‌রু।

বাউড়ির গায়েই কুদ (গুহা)। রাতের মত সেখানে ডেরা বানাল সে। টিলার ওপরে সেদিনের সেই প্রি গাছটি তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। তার একখানা ডালে আটকে পড়েছে শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ। কুদের ভেতর থেকেই দেখা যাচ্ছিল সে দৃশ্য। অম্‌রুর সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, চাঁদটা যেন ধান্‌নির মুখ, আর তার জোছনা ধান্‌নির ঘুন্‌ডি। যে ঘুন্‌ডি একদিন সে ঐ প্রি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছিল, আর ধান্‌নি বাউড়ির নীচ থেকে ঐ চাঁদের মত মুখখানা তুলে ছুটে এসেছিল তার ঘুন্‌ডিখানা নিতে।

যতক্ষণ চাঁদটা চোখের ভেতর ছিল ততক্ষণ তাকে শুধু দেখে গেল অম্‌রু, আর ফুঁ দিয়ে সুর তুলল তার বাঁশুরীতে। চাঁদ আড়াল হতেই ঠোঁট থেকে বাঁশুরী নামিয়ে আঁখ বুজল সে।

ভোরবেলা উঠে ভেড়বক্‌রি চরিয়ে বেড়াল অম্‌রু। এখানে বাউড়ির জল পেয়ে মলমল করছে সবুজ ঘাস। পুরো দলটা পেটভরে ঘাস, ঝোপঝাড়ের পাতাপত্তর আর বাউড়ির ঠাণ্ডা জল খেল। অম্‌রু টিলার ওপর উঠে প্রি গাছের তলায় বসে রুবানা বাজাল। গ্রাঁ (গাঁ)

থেকে দল বেঁধে এল মেয়েরা। অম্রু সরে গেল একটা টোহলের (শিলাখণ্ড) আড়ালে। বন্ধ রইল বাজনা। মেয়েরা পোশাক সাফ করে ঘড়েলুতে (ঘড়া) জল ভরে আবার গ্রাঁয়ের দিকে ফিরে গেল। তাদের মাথায় বসান পেতলের মাজা ঘড়েলুতে সূর্যের আলো ঝিলিক দিতে লাগল।

অম্রু আড়াল থেকে দেখে নিল, মেয়েদের ভেতর ধান্‌নি নেই। মনটা তার ভেঙে গেল। একবার মনে হল হোলি গ্রাঁয়ে ধান্‌নির বাপের বাড়ী ছুটে যায়। দেখা করে আসে ধান্‌নির সঙ্গে। ফের মনে হল, ঠিক হবে না এ কাজ। তার চলে যাবার পরে পাঁচজন হয়ত পাঁচটা কথা বলবে। একজন বিধবার চরিত্রে দোষ লাগবে অকারণে।

ভারধুপ (মধ্যাহ্ন) গড়িয়ে বিকেল এল মরা সোনার আলো মেখে। অম্রুর ভেড়বক্‌রির পাল বাউড়ির ধার থেকে এখন সরে গেছে একটা টিলার আড়ালে। অম্রু ক্যায়ল (চীর পাইন) বনের ভেতর ঘুরছে আর ভাবছে, এই বনের ও প্রান্তে সেবার শ্যারি উৎসব হয়েছিল। ক্যায়ল গাছের কাণ্ডখানা নিয়ে তু'দলে টানাটানির সময় সে পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছিল। অমনি কোথা থেকে সেদিন ছুটে এসেছিল ধান্‌নি। একেবারে অপরিচিত মানুষটাকে নিয়ে কত সেবাই না সে করেছিল।

একটা ক্যায়ল গাছে পাক দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল অম্রু। ঐ তো টিলার নীচে চরে বেড়াচ্ছে তার ভেড়বক্‌রির পাল। আরে ওখানে কে! বনের বাইরে এসে দাঁড়াল অম্রু। এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। একটা তিন-চার বছরের ছেলে তার গাভীন ভেড়ের গলা জড়িয়ে আদর করছে। তাদের তুজনের ওপরেই পশ্চিমের আকাশ থেকে গলে ঝরে পড়ছে সোনার ঝর্ণার জল।

অম্রুর কেন যেন মনে হল, ছেলেটি কোন মানুষের ঘরের নয়। হিমালয়ের অন্দরে কন্দরে যেসব দেবতাদের আস্তানা রয়েছে সেখান থেকে কোন দেবশিশু খেলতে খেলতে চলে এসেছে এখানে।

আশ্চর্য, ঐ ভেড়টি কিন্তু শিশুটিকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে না। তার

একরাশ কোঁকড়ানো সাদা চুলে গাল ঠেকিয়ে গল। জড়িয়ে খেলছে সেই দেবশিশু। যেন মন্ত্র পড়ে দিয়েছে কোন যাতুকর। অমরুর চোখে পলক পড়ছে না। সে পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একটি মেয়ের গলা বাউড়ির ধার থেকে শোনা গেল। মেয়েটি যেন উৎকণ্ঠায় কাউকে ডাকছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না কথাগুলো।

একসময় মেয়েটি গলা চড়িয়ে ডাকতে ডাকতে ছুটে এল টিলার এপারে। এখন অমরু দেখতে পাচ্ছে তাকে। মেয়েটি ভেড়টার কাছ থেকে টেনে সরিয়ে নিল ছেলেটিকে। ঐ ঘাসের জমিনে হাঁটু মুড়ে বসে শিশুটিকে ধমকাতে লাগল। কেঁদে উঠল ছেলেটি। অমনি মেয়েটি তাকে জড়িয়ে ধরে আদরে সোহাগে ভরে দিল। কোলে তুলে নিয়ে ফিরে চলল বাউড়ির দিকে।

এখন মুখোমুখি এগিয়ে আসছে মেয়েটি। টিলার ওপরে একটি পুরুষকে দেখে সে মুখখানা নিচু করে ফেলেছে।

অমরুকে হঠাৎ কে যেন একটা জীয়ন-কাঠি ছুঁইয়ে দিল। সে বরফ থেকে ছাড়া পাওয়া ঝর্ণার মত পাথরের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে নিচে নেমে গেল। একেবারে বাউড়ির ধারে, একেবারে মেয়েটির কাছে।

তুজনে এবার তুজনের দিকে চেয়ে রইল, কেউ কোন কথা বলতে পারল না।

কতক্ষণ পরে ধান্‌নির আঁখ ছাপিয়ে আঁসু গড়াল। সে মাথার ওপর জড়ানো সাদা ঘুন্‌ডিখানা টেনে নিয়ে চোখ ঢেকে ফেলল।

অমরু এবার কথা বলল, বহুৎ বহুৎ রোজ বাদ তোমার সাথে দেখা হল ধান্‌নি, তুমি কথা বলবে না?

ধান্‌নি মাথা নেড়ে জানাল সে কোন কথাই বলতে পারবে না।

পরক্ষণে স্থির চোখে অমরুর দিকে চেয়ে বলল, এতদিন বাদ তুমি এখানে আসতে পারলে?

অমরু বলল, এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে কথা বলা যাবেনা ধান্‌নি।

তুমি কি দু দণ্ড ঐ প্রি গাছের তলায় বসতে পারবে ?

এবার ধান্‌নি কোন উত্তর না দিয়ে টিলার দিকে পা বাড়াল। ধান্‌নির কাছ থেকে শিশুটিকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে পাথর ডিঙিয়ে ওপরে উঠতে লাগল অম্‌রু।

সেই প্রি গাছ। তার ডালে সেদিনের মত ধান্‌নির সেই ঘুনডিখানা ঝুলছিল না। দুজনে পাশাপাশি বসল। পুরানো দিনের কথা ভেবে আচ্ছন্ন হয়ে রইল কতক্ষণ। শিশুটি অম্‌রুর বাঁশুরী নিয়ে খেলা করতে করতে এক সময় ফেলে দিল। অম্‌রু সেটি কুড়িয়ে নিয়ে ফুঁ দিতেই শিশুটি আবার হাত বাড়িয়ে সেটি নিয়ে নিল। মুখে ঠেকিয়ে বাজাতে চেষ্টা করল। বাজল না।

অম্‌রু বলল, বহুৎ সুন্দর লেড়্‌কা। তোমার ?

ধান্‌নি শুধু মাথা নেড়ে জানাল, ছেলেটি তার।

অম্‌রু বলল, ঘাটারী তোমার কথা সবই বলেছে, কেবল তোমার বেটার কথা বলেনি।

ধান্‌নি চমকে তাকাল অম্‌রুর দিকে। ঘাটারীর মুখে তাহলে তার জীবনের দুর্ভাগ্যের কথা সব শোনা হয়ে গেছে।

না, আমার বেটার কথা লাল গ্রাঁয়ের কেউ জানেনা। আমার আদমীর দেহান্ত হবার খবর পেয়ে আমি হোলি গ্রাঁয়ে চলে আসি।

কেন ?

ওখানে আমাকে অপয়া বলল। তাই বহুৎ গুস্‌সা হল। চলে এলাম। যখন চলে আসি তখন বাচ্চা এসে গেছে।

দুজনের অনেক আলাপ হল। ধান্‌নি তার আদমীর কথা বার বার বলতে লাগল। শেষে বরফের চাঙড়ের তলায় চাপা পড়ার কথা বলতে গিয়ে আঁখ থেকে আঁসু গড়াল। বুক ভাসল জলে।

এক সময় ঘুন্‌ডিতে আঁখ মুছে ধান্‌নি বলল, তুমি সাদি করনি ?

করেছি ধান্‌নি। একটা খোঁড়া মেয়েকে নিয়ে সংসার পেতেছি। সে খোঁড়া, কিন্তু দুরন্ত কাজ করতে তার জুড়ি নেই।

আর কিছু জানতে চাইলনা ধান্‌নি। উদাস হয়ে গেল।

অম্‌রু বলল, তুমি কি পিতাজীর কোঠিতে জনমভোর কাটিয়ে দেবে, না ফের সাদি করবে?

ধান্‌নি বলল, সাদির সখ মিটে গেছে আমার। এখন এই লেড়্‌কাই আমার ভরসা। ওকে নিয়ে বাকী জীবনটা পার করে দিতে চাই।

অম্‌রু ছেলেটির গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, একে তুমি নিশ্চয় পহাল বানিয়ে আর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরাবেনা?

ধান্‌নি যেন আশমান থেকে পড়ল, কেন! ও পহালের বেটা, পহালের কামকাজ করবে না তো কি করবে! জরুর ভেড়বক্‌রি চরাবে।

অম্‌রু ধান্‌নির মনের জোর দেখে ভারী খুশী হল। সে অমনি বলল, আমি যদি সে সময় জিন্দা থাকি তাহলে তোমার বেটাকে সাথ সাথ নিয়ে ঘুরব।

হঠাৎ অম্‌রুর হাতখানা টেনে নিয়ে বাচ্চার মাথায় ঠেকিয়ে ধান্‌নি বলল, এ আমার বেটার বহুৎ ভাগ্য।

আরও দুদিন বাউড়ির ধারে ভেড়বক্‌রি নিয়ে রইল অম্‌রু। রোজ বেটাকে নিয়ে সেখানে এল ধান্‌নি। নিজের হাতে রুটি পাকিয়ে, সব্জি বানিয়ে খাওয়াল।

ধান্‌নির সেই বিশেষ হাসিটি হেসে বলল, তোমার বউ এর রান্নার হাত তো আমি পাবনা। তবু খাও। দুদিন তোমাকে খাইয়ে আর একজন নাহয় কিছু তৃপ্তি পেল।

ঘাস ফুরাল, এবার দলবল নিয়ে যেতে হবে অন্য কাণ্ডায় (চারণ ক্ষেত্র)।

যাবার দিন নিজের সোনার বালাংখানা (বিবাহিতা মেয়েদের নাকের গহনা) অম্‌রুর হাতে তুলে দিয়ে ধান্‌নি বলল, এ বালাং তোমার বহুকে মানাবে ভাল। তাকে বলবে, তার এক বহিন বহুৎ পেয়ার

করে এটা দিয়েছে।

অম্‌রু হাত পেতে বালাংখানা নিয়ে তার বগ্‌লির (মনিব্যাগ) ভেতর যত্ন করে রেখে দিল। পরে বলল. খেয়াল আছে ধান্‌নি, পহেলে যে রোজ তোমার সাদি হয়েছে কিনা জানতে চাই. তুমি হেসে নাকের খালি পাটা উঁচিয়ে দেখিয়েছিলে।

ধান্‌নি মাথা নেড়ে জানাল, সব মনে আছে তার। মুখে বলল, সাদি হলে তবে তো নাকে বালাং উঠবে।

কলেল (সন্ধ্যা) ঘনিয়ে উঠছিল। ধান্‌নি অম্‌রুর দুটো হাত ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এখুনি গ্রাঁতে ফিরতে হবে। কাল আবার তড়কার (উষা) আগেই দল নিয়ে বেরিয়ে যাবে অম্‌রু।

আমি তোমার বেটাকে কিছু দিয়ে যেতে চাই ধান্‌নি।

যো খুশ।

অম্‌রু আসন্ন-প্রসবা ভেড়টাকে নিয়ে এল। বলল, শিগ্‌গির এর বাচ্চা হবে। বাচ্চা নিয়ে দিন ভর খেলকুদ করবে তোমার বেটা। খেলা করতে করতে ভেড়বক্‌রিকে পেয়ার করতে শিখবে। তখন ধীরে ধীরে সাচ্চা পহাল বনে যাবে।

সরল উপত্যকায় নিজের ডেরায় পৌছে অম্‌রু হঠাৎ একটা ধাক্কা খেল। তার মনে হল, এই প্রথম সে জীবনে বড় রকমের একটা অন্যায় করল। এ বছর সাচ্‌ জোৎ পেরিয়ে নীচে নেমে চন্দ্রভাগায় সে তার মায়ের ভুজ্যি ভাসাতে পারলনা।

দুদিন সরলে কাটাল সে। কিন্তু এই দুদিন তার কানের ভেতর মৌমাছির মত একটি কথা গুন গুন করে ফিরতে লাগল, তুই আমাকে ভুখা রাখলি অম্‌রু, তুই আমার ভুজ্যি ভাসালিনা।

তৃতীয় দিনেই অম্‌রু স্থির করে ফেলল, সে তার মায়ের ভুজ্যি চন্দ্রভাগায় ভাসিয়ে আসবে। পথ আর জোৎ•বরফে ছেয়ে গেলেও

সে তার ভুল শুধরে আসবে। তার মনে গভীর বিশ্বাস, আসা যাওয়ার পথে তাকে রক্ষা করবে তার মা।

সরল থেকে কটি দল নেমে যাচ্ছিল নীচে, কাংড়ায়। তাদের ভেতর পরিচিত একজন যাচ্ছিল ধরমশালায়। অমৃরু তার সঙ্গে ব্যবস্থা করে পুরো ভেড়বকৃরির দলটাকে পাঠিয়ে দিল মামা পারষোত্তমের কোঠিতে। বলে দিল, সে পিছু আসছে।

এরপর সাচ্ জোতের দিকে পা চালিয়ে চলল অমৃরু। হাজার হাজার ভেড়বকৃরি নিয়ে পহালদের সঙ্গে মিলে মিশে যাওয়া আর এই বরফ-ছাওয়া পথ পেরিয়ে একা যাওয়ায় ফারাক আছে বইকি। তবু চলেছে অমৃরু। মনে তার বল, মায়ের ভুজ্যি সে দিয়ে আসবেই।

ভেড়বকৃরি সঙ্গে নেই তাই চার রোজের পথ একরোজ লাগল পার হতে। তুষার ঝড় বইল, পর্বতের কুদে (গুহা) সে আশ্রয় পেল। মুখে শুধু প্রার্থনা. মা তোমার খানা নিয়ে চলেছি, তুমি রক্ষা কর।

চন্দ্রভাগার স্রোত যেখানে অমৃরুর মাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ঠিক সেখানটিতে এসে দাঁড়াল অমৃরু। কুলহারা (কুঠার) দিয়ে বরফ কেটে সরিয়ে স্রোতের শব্দ শুনতে পেল। ঐ তো তার মা কথা বলছে, কিরে বাপ এলি।

অমৃরু মায়ের আত্মার শান্তির জন্য ভুজ্যি ভাসিয়ে নমস্কার করল। মুখে বলল, মা, আমি কোনদিনও আর এরকম ভুল করব না।

এবার ফেরার পালা। কদিনেই বরফ পড়ে দুর্গম করে তুলেছে পথ। অমৃরু মায়ের নাম জপ করতে করতে উৎরাই এর পথে নেমে চলল। সামনে পড়ল খরস্রোতা নালা। দু'খানা ক্র্যা গাছের কাণ্ড ফেলে টাংড়ি (সেতু) তৈরী করে রেখেছে জংলাৎ ম্যাকৃম (বনবিভাগ)। বরফ পড়ে পিচ্ছল হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। অমৃরুকে কে যেন বলে দিল, বহুৎ হুঁশিয়ার হয়ে চলবি বেটা। কোমর থেকে ডোরখানা (ছাগললোমে তৈরী গদ্দীদের ব্যবহারের দড়ি) খুলে নিয়ে আচ্ছা করে টাংড়ির সঙ্গে বেঁধে পার হয়ে যা।

তাই করল অমৃরু। ডোরখানা যায় যাক্, প্রাণ তো বাঁচল।

গোয়ারি গ্রাঁতে এসে দেখল, তামাম আদমী নীচে কাংড়ার দিকে নেমে গেছে। প্রতিটি ঘরের দরজায় শেকল তোলা। কাদা দিয়ে লেপেপুছে রেখে গেছে। ফাঁক ফোকর দিয়ে যাতে ইঁদুর ভেতরে ঢুকে তামাম আসবাবপত্র কাটাকুটি না করতে পারে।

পর পর তিসা, নাকরোর, কালহেন পেরিয়ে এল অমৃরু, ঐ একই ছবি: ছোট ছোট গ্রাঁগুলো ছেড়ে সবাই নেমে গেছে নীচে। এরপর শুধু হয়ে যাবে বরফ পড়া। প্রচণ্ড শীতের কামড়ে নেমে আসবে হিমশীতল মৃত্যু।

সুরঙ্গানি গ্রাঁতে যখন এসে পৌছল, কলেল (সন্ধ্যা) ঘনাতে তখন বেশী বাকী নেই। রাতের মত এখানে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই কি পাওয়া যাবে!

অমৃরু ঘুরতে লাগল। সব কটা কোঠির মালিক দরওয়াজায় শেকল তুলে নেমে গেছে। সে একটা ঘরের শেকল খুলে রাতের মত ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু আজ্ঞা না পেলে কারু ঘরে ঢোকার নিয়ম নেই। বাইরে ঠাণ্ডায় মৃত্যু হলেও না।

হঠাৎ এক চিলতে আলো তার চোখে এসে পড়ল। আলো লক্ষ্য করে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। গ্রাঁয়ের শেষ সীমায় পাহাড়ের খাঁজে একটা কোঠি। তার ভেতর কেউ লকড়ি জ্বেলে আগুন ধরিয়েছে।

কোঠিতে কে আছ?—হাঁক পাড়ল অমৃরু।

তুমি কে?—কোন বৃদ্ধের ভাঙা গলা বলে মনে হল।

আমি পহাল, তবে ভেড়বক্‌রি সঙ্গে নেই। রাতের মত আশ্রয় মিলবে?

দরওয়াজা ঠেলে অন্দরে চলে এসো। বহুৎ জায়গা, স্রেফ এক আদমী।

অমৃরু ঢুকে পড়ল কোঠির মধ্যে।

মানুষটির গলা শুনে যতটা বয়েস আন্দাজ করা গিয়েছিল তার চেয়েও বেশী বয়েস লোকটির।

অমৃরু আগুনের ধারে বসে পড়ল।

লোকটি মাকড়সার জালের মত রেখা পড়া মুখখানা একটুখানি তুলে প্রশ্ন করল, এ সময়ে কেউ তো এখানে থাকে না। তুমি হঠাৎ কোথা থেকে ?

অমৃরু একেবারে সংক্ষেপে তার সুরঙ্গানি গ্রাঁতে ঢুকে পড়ার কারণটা বলে গেল।

বুড়ো সব শুনে কতক্ষণ চেয়ে রইল অমৃরুর দিকে। এক সময় বলল, তুমি মায়ের খানা নিয়ে এ সময় সাচ্ জোৎ পেরিয়ে গেলে!

হাঁ জী। ভুল তো আমার। তাই পেরাশ্চিত্তি করলাম।

এবার লোকটি কোন কথা না বলে মাথা নীচু করে বসে রইল।

কতক্ষণ পরে মুখ তুলে বলল, আমার উমর কত বলতে পার ? চার কুড়ি আট (অষ্টআশি)। আমার এত বয়সে এমন কথা কখনও শুনিনি। মায়ের জন্য এমন অসাধ্যসাধন করতে কাউকে দেখিনি।

অমৃরু বলল, অন্য সব গ্রাঁতে সবাই চলে যায়, নয়তো ছ' দশজন থেকে যায়। কিন্তু এখানে তো কাউকে দেখলাম না। একা আপনি কাটাবেন কি করে ?

তোমাকে কে বলল আমি একা আছি, আমার সঙ্গে আছে মনের জোর, যা শরীরের তাগদের চেয়ে অনেক দামী।

বৃদ্ধ মানুষটির মনের জোর দেখে অবাক হয়ে গেল অমৃরু।

লোকটি একটু থেমে আবার বলল, আমার খালি সাহস আছে, আর তোমার ভেতর সাহস, দরদ দুটোই আছে। এই এতটুকু বয়সে দুটো রাখতে পেরেছ, বড় তাজ্জব ব্যাপার। বেটা, কি নাম তোমার ?

অমৃরু।

খাসা নাম। শুদ্ধ কাম।

বৃদ্ধ মনে মনে কতক্ষণ বিড়্ বিড়্ করল।

অমৃরু বলল, আপনার কোঠির সব আদমী কি নীচে নেমে গেছে ?

হাঁ বেটা। লেড়্কা, বহু, পুতা সব নেমে গেছে। বসন্ত্ আসলে তখন ফিরবে।

বৃদ্ধ চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। তাকে কেমন যেন উদাসীন দেখাল।

আরাম কর বেটা। আধা রাতে আর আগ জ্বলবে না।

অমৃরু জানে, বুড়োবুড়িদের এ সময় বহুৎ তকলিফ্ পোহাতে হয়। ঘরের জোয়ানগুলো নীচে নেমে যায়। বুড্ঢা বুড্ঢি থেকে যায় ওপরে। আড়াই, তিন মাহিনার মত রসদ আর কিছু জ্বালানি লকড়ি রেখে যায়।

রাতে বিছানায় যাবার আগে বৃদ্ধ বলল, আমি বার্লি গরম পানিতে গুলে খাব বেটা। তুই রোটি বানিয়ে খা। আটা আছে ঘরের ঐ কোণায়।

আমার থলেতে সব আছে চাচাজী, আপনাকে কোন ভাবনা করতে হবে না।

না রে বেটা, তোকে মহাদেও এখানে পাঠিয়েছে, তুই আমার কোঠিতে যা আছে তাই খাবি। তোকে খাওয়ালে আমার দিলটা ভরবে।

অমৃরু বলল, আপনার যা আজ্ঞা।

অমৃরু রুটি বানিয়ে খেল। বৃদ্ধ মানুষটি বার্লি গুলে খেল জলে।

খেতে খেতে অমৃরু বলল, রোজ আপনি এই খানা খান চাচাজী ?

এখনও লহুরীতে (বাড়ীর সংলগ্ন বাগান) দু'চার রকম সব্জি পাওয়া যাচ্ছে। কাল তুই তুলে এনে রোটির সঙ্গে সাব্জিও বানিয়ে নিস।

অমৃরু বলল, চাচাজী, দালও কিছু রয়েছে আপনার ভাঁড়ারে।

বৃদ্ধ হাত নেড়ে বলল, ওসব আবার কে পাকাবে বল্। তুই পাকিয়ে খাস।

অমৃরু দেখেছে বুড্ঢা আদমীর খানাপিনায় লালচ থাকে, কিন্তু এ মানুষটি একেবারে আলাদা। সে বলল, কাল আমার চলে যাবার কথা,

তবু আর এক রোজ থাকব আমি আপনার পাশে। আপনা হাতে খানা বানিয়ে আপনাকে খাইয়ে যাব।

তুই থাকলে আমি খুশী হব বেটা, তবে খানাপিনায় আমার লালচ নেই। বড়িয়া খানা খাও আর মক্কির দানা খাও, দু-ই সমান। ভুখ্ লাগলে সব খানাই অমৃত। ভুখা আদমী পোড়া রুটি পেলে তার দিল্ ভরে ওঠে, আর রাজবাড়ীর খানা খেয়েও রাজার মুখ ব্যাজার হয়ে যায়।

বৃদ্ধ লোকটির কথার ধরণ দেখে অম্রুর ভারি ভাল লেগে গেল।

রাতে দেখা গেল বৃদ্ধটি একখানা পাট্টু গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। আগ জ্বলল না, সারা রাত ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া বইল।

. বিহাগের (সূর্যোদয়) ছোঁয়া লাগল বাইরের উঠোনে। বৃদ্ধ উঠে লহ্‌রীর (গৃহ-সংলগ্ন বাগান) দিকে চলে গেল। অম্রু দেখল, সামান্য একখানা খিন্দ্ (ছেঁড়া কাপড়ে তৈরী কাঁথা) গায়ে জড়িয়ে প্রায় নব্বুই বছরের মানুষটি সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হেঁটে বেড়াচ্ছে।

অম্রু ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। উঠোনে ভোরের রোদ হাসছে। বৃদ্ধ এসে অম্রুর পাশে দাঁড়াল।

অম্রু বলল, চাচাজী, হিত (শীত) বোধ আপনার বহুৎ কম।

বৃদ্ধটি ভোরের মিঠে রোদের মত হেসে বলল, তাহলে এক কাহানি শোন্। এক সময় হিমালয়ে তীর্থ করতে গিয়ে এক সাধুকে দেখেছিলাম। বরফের ওপর একদম নাঙ্গা হয়ে শুয়ে আছে। বললাম, সাধুবাবা একখান পাট্টু (কম্বল) দিতে দিল চাইছে।

সাধুবাবা হা হা করে হেসে উঠে বলল, খালি একঠো পাট্টু দিবি? হিমালয়ের মত উঁচা পাট্টুর পর্বত বানিয়ে দে, তাহলে তার ভেতর ঢুকি।

এবার উঠে বসে বলল, বেটা, বাইরের কোন জিনিস গরম বা ঠাণ্ডা করে না। দেহটাকে খুশিমত ঠাণ্ডা গরম রাখে এই মনটা। আমার মনই হিত ঠেকিয়ে রেখেছে, ফাল্‌তু তোর পাট্টুখানা নিয়ে কি করব রে বেটা।

সেই থেকে আমিও হিত তাড়িয়ে চলেছি।

অমরু দেখল মানুষটি খাওয়া পরা দুটো ব্যাপারেই নিজেকে শাসন করার হিম্মত রাখে।

এক সময় আগুন জ্বালতে গিয়ে অমরু দেখল রসুই ঘরে লকৃড়ি যা আছে তা দু' হপ্তাও চলবে না। সে এ নিয়ে বৃদ্ধ মানুষটিকে কোন কথাই বলল না।

দো-পহরের (মধ্যাহ্ন) খানাপিনার পাট চুকলে সে বনের দিকে বেরিয়ে গেল তার কুল্‌হারাখানা নিয়ে।

বনের ডাল পাতায় তুষার পড়েছে। ঠিক যেন সাদা চাদর মুড়ি দিয়েছে গায়ে। এ সময় ওরা গা ঢেকে হাইউন্দের (শীত ঋতু) ঘুমের আয়োজন করে।

অমরু হাঁটু গেড়ে বসল। বনের আত্মা বানবীরকে উদ্দেশ করে বলল, অসময়ে তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি প্রভু। এক বুড্‌ঢা আদমী, বহুৎ উমর তার, একা সুরঙ্গানি গ্রাঁ পাহারা দিচ্ছে। দোসরা কোই নেই তার দেখ্‌ভাল করবার। প্রভু, তার লকৃড়ির দরকার। কৃপা করে আজ্ঞা দাও, কিছু লকৃড়ি নিয়ে যাই।

কথাগুলো বলে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইল সে। কিছু পরে মনের মধ্যে বানবীরের অনুমতি পেয়ে উঠে দাঁড়াল অমরু।

কতকগুলো ডাল কেটে তার থেকে জ্বালানি কাঠ তৈরী করে জড়ো করল। সে কাঠ বয়ে এনে রসুই ঘরের এক কোণায় সাজিয়ে সাজিয়ে রাখল। অমরুর কাণ্ড দেখে হাসতে লাগল চাচাজী। সাবাস বলল না, আবার বারণও করল না।

দিনের পর দিন যায়, অমরু বৃদ্ধের কথা শোনে। এ কথা রোজ দিনের ঘরোয়া কথা নয়। এ কথায় বৃদ্ধের উপলব্ধির যাদু মিশে থাকে।

শুনতে শুনতে কতদিন পার হয়ে গেল। তুষার ঝরে উঠোন ভরে উঠল। ঝড়ের হাওয়ায় তামাম চরাচর কাঁপতে লাগল। ইঁদুরগুলো কোন কোঠিতে ঠাঁই না পেয়ে বুড়োর ঘরে সিঁধোলো। কটা চিড়ি

পাখি (চড়াই) ঠিক সময়ে নীচের পাহাড়ে নেমে যেতে পারে নি, তারা রয়ে গেল বৃদ্ধ মহেশ প্রসাদের চালার ভেতর।

রোজ বিহাগে আর দো-পহরে মহেশপ্রসাদ সামনের উঠোনে দানা ছড়িয়ে দিতে দিতে পাখীদের ডাক দেয়। চিড়িগুলো কোঠির ভেতর থেকে উড়ে এসে উঠোনে নেচে নেচে দানা খুঁটে খায়।

মহেশপ্রসাদ যেন অতিথিকে পাত পেড়ে খাওয়াচ্ছে। বলে, আর দেব? পেট ভরল?

অম্‌রু বলে, চাচাজী বহুৎ ঠাণ্ডা, তুমি অন্দরে এসে বস, ওরা আপনি খেয়ে নেবে।

হাসে মহেশপ্রসাদ। সেই দিল ভরানো হাসি। বলে, পঞ্ছী বলে তার মান নেই? আমি খানার জন্য ডাক যখন দিয়েছি, তখন সে আদমী হোক্, জানোয়ার হোক্ আর পঞ্ছী হোক্, সে আমার অতিথি তাকে খাতির করতে হবে বৈকি বেটা।

একদিন কথায় কথায় চাচাজীর মুখ থেকে অম্‌রু শুনল, তার এক জোয়ান লেড়্‌কি হেন্ (হিমশৈল) ভেঙে পড়ে খতম হয়ে গেছে।

অম্‌রু অমনি প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর আচরণ সম্বন্ধে দুঃখ করতে লাগল।

বুড়ো মহেশপ্রসাদের মুখে কিন্তু শোকের চিহ্ন নেই। সে সহজ গলায় বলল, যে মারে সেই তো বাঁচায় রে। যে বরফের চাঁই আমার লেড়্‌কিকে মারল, সে বরফ গলে জল হল। সেই জল নদী, নালা, কুহল (চাষের জমিতে প্রবাহিত নালা) বয়ে আনল চাষের ক্ষেতে। ফসল ফলল, কত মানুষ বাঁচল।

অম্‌রু এই মহেশপ্রসাদের কাছে তার জানার বাইরে বহুৎ কথা শিখল।

একসময় হাইউন্দের দাপট কমল। বসন্ত্ এল হাওয়ায় হাওয়ায়। নীচের থেকে ঝাঁক ঝাঁক পঞ্ছী উড়ে এল সুরঙ্গানির বনে। সাদা, গোলাপী ফুলে ছেয়ে গেল ডাল। মহেশপ্রসাদের কোঠি থেকে চিড়িপাখি ফুরুৎ ফুরুৎ করে উড়ে পালাল।

মহেশপ্রসাদ রোদ্দুরে ভরা উঠোনে দাঁড়িয়ে দু হাত তুলে বলতে লাগল, ফির আসবি। আর কিছু না মিলে, শুখা মক্কির দানা মিলবে।

অম্রু বলল, চাচাজী আমাকে বিদায় দাও। ফির দেখা হবে।

মহেশপ্রসাদ বলল, জরুর দেখা হবে। উমর তো কম হল না। যদি দেহান্ত্ হয়ে যায় তাহলেও দেখা হবে।

অম্রু অবাক হয়ে মহেশপ্রসাদের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সেই আলোর মত অনাবিল হাসি।

কেউ মরে না রে বেটা, কেউ মরে না। পহালের এই দেহটা ভেঙে যায়, আর এক পহাল ভেড় চরায়। যে জিন্দা আছে তার ভিতর, যে নেই সে রয়ে গেল।

অম্রু নেমে চলল কাংড়ায়। দিল তার ভরে উঠেছে মহেশপ্রসাদের সঙ্গ পেয়ে। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, বহু বেটার ভাবনা সে উড়িয়ে দিল বসন্তের হাওয়ায়। পথ চলতে চলতে তার মনে হল, সে অম্রু বলে আলাদা কোন আদমী নয়, সে একটা পহাল। রুবানা বাজিয়ে, বাঁশুরী বাজিয়ে, হ্যালা হুঁই, হ্যালা হুঁই করতে করতে বনবাদাড় ফুঁড়ে, পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে সে চলেছে তো চলেছেই।

॥ পাঁচ ॥

এমনি করে কোথা দিয়ে পঞ্চাশটা বছর পার হয়ে গেল অম্রুর জীবনে। এখন সে বাহাত্তর বছরের বুড়ো। বিশাল এক ভেড়বক্রি দলের মালিক। সারাক্ষণ চারটে বাওয়াল আর পাঁচ পাঁচটা কুত্তর রয়েছে তদারকিতে। তবু অম্রু আজও শীত ও গ্রীষ্মের চারণে কাংড়া থেকে পাঙ্গী উপত্যকায় চষে বেড়ায়। ছাজু বুড়োর সেই কথাটা বার বার তার কানে বাজতে থাকে, 'ঐ যে উনি উমর কত? ঐ যে দেহারা (সূর্য) গো। আকাশে যিনি সৃষ্টিকাল থেকে জ্বলছেন আর চলছেন। চলছেন বলেই জিন্দা আছেন, থামলেই মরবেন। যে চলবে সে জিন্দা

থাকবে। গদ্দী পহাল জন্মেছে চলার জন্যে।

অম্রু আজও চলেছে। চলায় তার বিরাম নেই। নীল আকাশ, বরফের পাহাড়, সবুজ ঘাসের কাণ্ডা তাকে থামতে দেয় না। প্রতি মুহূর্তে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

কত পরিবর্তন ঘটে গেল তার চার পাশের জগতে। কত বিপর্যয় ঘটল তার সংসারে। কিন্তু অনন্তকাল ধরে ছুটে চলা ইরাবতীর মত তার জীবনধারা অপরিবর্তনীয় রয়ে গেল।

কতবার ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে। বিশাল হেন্ বা বরফের স্তূপ ধ্বসে পড়ে ধ্বংস করে দিয়েছে তার ভেড় বক্‌রির দল। খড়েরু আর গলঘটু রোগে মুখে পায়ে ঘা হয়েছে, গলা ফুলে গেছে। মড়কে মারা পড়েছে শত শত ভেড়বক্‌রি। উঁচু চারণভূমিতে লোভীর মত অতি পুষ্টিকর নিরু ঘাস খেয়ে পেট ফুলে মরেছে কত। তবু তার এই স্রোতের মত বয়ে চলা ভেড়বক্‌রির দল ছেড়ে অন্য কোন ধন বা সম্পদের পেছনে ঘোরেনি অম্রু।

এই পঞ্চাশটি বছরে ক্রমাগত পরিবর্তনের ঢেউ তোলপাড় করে তুলেছে সুখা গাদেরানের সহজ জীবনযাত্রা। পাহাড়ের কঠিন দেহ কেটে ধূসর কালো অজগরের মত নীচের সমতল থেকে পাকে পাকে উঠে এসেছে সরকারী রাস্তা। বিপাশা, ইরাবতীর খরস্রোতকে শাসন করে তৈরী হয়েছে সেতু। গর্জন করতে করতে বহু নীচের জনপদ থেকে সুউচ্চ গাদেরানে উঠে আসছে যন্ত্রযান। লাহুলী, চম্বিয়ালী, পাঙ্গীয়ালীর পিঠের থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে পণ্য-বোঝা। বহু যুগের পদচিহ্ন লাঞ্ছিত লাদাক, তিব্বত, চম্বার পথ মুছে যাচ্ছে নতুন পরিকল্পনায়, নতুন সম্প্রসারণে। নওরাতে, দশেরায় যে সব উল, কম্বলের ব্যবসা চলত তা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে সমতলবাসীদের হাতে। মাণ্ডি, অমৃতসর থেকে সুদ, ক্ষেত্রী ব্যবসায়ীরা সরল পাহাড়ী মানুষদের হাত থেকে কৌশলে হাতিয়ে নিয়েছে ব্যবসায়ের চাবিকাঠি।

শুক্‌রা পাথরের টুকরোয় রুণ্‌কা ঘষে যে গদ্দীরা আগুন জ্বালত তাদের হাতে এখন ব্যবসায়ীদের ধরিয়ে দেওয়া দেশলাই। দেহারা

আর চানানির আলো যাদের ছিল দিন রাতের বাতি তাদের হাতে এসে পৌঁছেছে টর্চ। সমতলের বাজার গঞ্জের নকল সস্তার গহনায় ছেয়ে গেছে গাদেরান (গদ্দীদের বাসভূমি)। সেই চটকদারী গহনায় গা সাজাতে মেয়েদের আজ সে কি হুড়োহুড়ি।

এখন ভারধুপে দেহারার তেজ আর সহ্য হয় না। ব্যবসায়ীরা ছাতা ধরিয়ে দিয়ে গেছে হাতে। নারেলি আর ছিলমের ব্যবহার কমে আসছে। ছেলে ছোক্‌রার দল ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট গুঁজে ঘুরে বেড়ায়। যে গদ্দীরা বনে পাহাড়ে খালি পায়ে চলতে অভ্যস্ত ছিল তারা এখন নীচের তলার ব্যবসায়ীদের জোগান্‌ দেয়া জুতো পাল্‌টাচ্ছে ঘন ঘন।

অম্‌রু চোখ খোলা রেখে চারদিকের এই পরিবর্তন চেয়ে চেয়ে দেখে।

ছেলেদের জন্য স্কুল করে দিয়েছে সরকার। এখন ভেড়বক্‌রি চরাবার জন্য ছোট ছোট ছেলে পাওয়া মুশকিল। যে ভেড় বক্‌রির পাল লালনপালন করে গদ্দীদের সংসার চলত সুখে এখন সেই পহাল-জীবন থেকে অনেকে সরে আসতে চাইছে। এখন সম্মানের কাজ মকাই, গম ফলান নয়, ভেড়বক্‌রি পালন নয়, ফলের বাগান করা। সমতলের ব্যবসায়ীরা আগাম দাদন দিয়ে যায়। ফল উঠলে নিয়ে যায় গাড়ী বোঝাই করে।

অম্‌রুর তিন ছেলে এক মেয়ে। মেয়েটিকে সুন্দরী দেখে উঁচু সম্প্রদায়ের লোকেরা বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। অম্‌রু হাঁকিয়ে দিয়েছে তাদের। বলেছিল, আমার বাপ পহাল, আমিও পহাল। পহালের বেটি পহালনি। পহালের সঙ্গেই সাদি হবে ওর।

মেয়ে টাসি বাপকে বড় ভালবাসে। উজলকে সাদি করে সে ভারি সুখে আছে। উজল বড় একটা সুপুরুষ নয়, তবে বিশ বছরের শরীরটা তার বলিষ্ঠ, সুগঠিত। খুব ছোট একটা ভেড়বক্‌রির পাল রয়েছে তার। তাই নিয়ে টাসি আর উজল বেরিয়ে পড়ে চারণে। তারা কালিছো জোৎ পার হয়ে লাহুল চলে যায়। উজল পথে কোন কুদে

যখন বিশ্রামের জন্য থামে তখন তাকে কোন কাজ করতে দেয় না টাসি। সে নিজেই পাহাড়ী পথ ধরে চলে যায় বাউড়ির দিকে। জল ভরে আনে চামড়ার থলেতে। আগুন জ্বালে, রুটি আর সব্‌জি বানায়। এ সময় তার খোঁড়া মায়ের মুখখানা বড় বেশী মনে পড়ে। বছর দুয়েক আগে মা মারা গেছে তার। মারা যাবার দিনও বাবাকে রেঁধে খাইয়ে গেছে। শেষ রাতে নীচের পাহাড়ের এক কাণ্ডায় ঘুমের ভেতরেই মারা যায় ঘুঙরী। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অমরুর কাছ ছাড়া হয়নি সে।

তিন ছেলেকে নিয়ে কোন দিনই সুখী হতে পারেনি ঘুঙরী আর অমরু। সব থেকে ছোট মহান্ত্‌, বাপ মায়ের আদরের ধন। কিন্তু যন্ত্রণার কারণ ছিল সেইই সবচেয়ে বেশী। একখানা পা তার ছেলেবেলা গড়িয়ে পড়া পাথরের আঘাতে থেতলে পঙ্গু হয়ে যায় চিরদিনের মত। অতি সৎ ছেলে মহান্ত। ধরমশালায় মামা পারষোত্তমের কাছ থেকে পাওয়া বাড়ি আর ক্ষেতি এই খোঁড়া ছেলেটিকেই দিয়েছে অমরু। ছোটবেলা মহান্ত্‌ চোখের জল ফেলে বলত, পিতাজী আমি তোমাদের সঙ্গে ভেড়বক্‌রি নিয়ে উড়াঙ্কারে যাব। নিরু ঘাসের কাণ্ডায় ভেড় চরাব।

কতভাবে সে সময় প্রবোধ দিতে হত মহান্ত্‌কে। আজ সে বড় হয়েছে। সব কিছু বুঝতে শিখেছে। এমন সুদর্শন ছেলে বড় একটা চোখে পড়ে না। মহল্লার ভারী মিষ্টি মেয়ে কুড়ি নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করেছে মহান্ত্‌কে। রাত দিন সংসারের কাজ আর পঙ্গু স্বামীর সেবা করে তার দিন কাটে।

বেশ লম্বা ক্ষেতির এক প্রান্তে একটা তাপ্রি। কাঠের তৈরী, খড়ের ছাউনি দেওয়া। তার ওপর বসে বসে বাবার শেখান রুবানা আর বাঁশুরী বাজায় মোহান্ত্‌। আসুজ মাসে যখন মক্‌কির লোভে রীচ বা ভালুক ঢুকে পড়ে ক্ষেতে তখন বেদম জোরে ক্যানেস্তারা পিটিয়ে ভালুক আর বুনো জন্তু তাড়ায়। ওদের বছর দশেকের একটি ছেলে। ইস্কুলে যায় না। দাদু কবে হাইউন্দের চারণে নীচে নেমে আসবে, রাত দিন বাপ মায়ের কাছে সেই খোঁজ তার। বাপ-মা ছেলের নাম রেখেছে

সুখিয়া। অম্‌রু ওকে ডাকে দাববু বলে। শীতের দিনে ভেড়া নিয়ে নীচে ফেরার সময় অম্‌রু ছোট ছেলের কাছে মাস তিনেক কাটিয়ে যায়। এবারও সে এসেছে। কোঠির পেছনের ওরিতে ভেড়বক্‌রির থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। দাদুর পেছন পেছন জোঁকের মত লেগে আছে দাব্‌বু। খালি তার একটি কথা, দাদাজী বল না, তুমি আমাকে কবে তোমার সঙ্গে কাণ্ডায় নিয়ে যাবে।

একটা ছোট্ট কুল্‌হারা তুলে ধরে বলে, আর এই যে কুল্‌হারা দেখছ, লক্কর বাঘাকে কেটে দুখান করে দেব।

অম্‌রু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তার বংশধরকে। মহাস্তু আর কুড়ি পাশে দাঁড়িয়ে ছেলের কাণ্ড দেখে হাসে।

কুড়ি বলে, পিতাজী, বড্‌ড দুষ্টু হয়েছে আপনার নাতি। ইস্কুল থেকে আবার সেই মাস্টারজী এসেছিলেন ওকে ভর্তি করে দেবার কথা বলতে।

অম্‌রু কিছুক্ষণ ছেলে বউএর দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, আবার এসেছে লোকটা। নিশ্চয় বদ মতলব আছে, ওকে এবার থেকে কোঠিতে ঢুকতে দিও না।

এক বছর আগে যখন এ বাড়ীর সঙ্গে পরিচিত হতে এসেছিল লোকটি তখন অম্‌রু ছেলে বউ-এর কাছেই ছিল। নাতির পড়ার ব্যাপার নিয়ে কথা হয়েছিল অম্‌রুর সঙ্গে।

আপনাদের ছেলেটি ভারী বুদ্ধিমান, ওকে পাঠিয়ে দিন আমার ইস্কুলে।

অম্‌রু বলেছিল ও গদ্দীর ছেলে। ওকে যখন পড়াবেন তখন ভেড়-বক্‌রিদের পড়াবেন তো? নইলে সে বেচারারা যাবে কোথায়?

হো হো করে হেসে উঠেছিল মাস্টারজী।

অম্‌রু আবার বলেছিল, মাস্টারজী বিহান্নুতারা (ধ্রুবতারা) যে স্থির হয়ে চেয়ে থাকে, সে কি শেখায় বলতে পারেন? জুসমুসা থেকে কলেল অব্দি সারা আকাশটা পেরিয়ে যাবার সময় দেহারা বা সূর্য আমাদের কি কি শিখিয়ে দিয়ে যায়? নালা, কুহল, যখন ছোটে তখন কি বলতে

বলতে ছোটে ?

মাস্টারজী চুপ করে গিয়েছিল। অম্রু ছাড়ে নি। আবার প্রশ্ন করেছিল, ভেড়ের তির্নি (ট্যাক্স) এখন পাঁচ পয়সা আর বক্রির দশ। একই সঙ্গে দুটি প্রাণী চলেছে তবু দুজনের তির্নির এত তফাৎ কেন ? নিরু ঘাস কত লম্বা হয় ? তউন্দি আর হাইউন্দের শুরুতে যে দুবার লোমছাঁটাই হয় সে লোমের পরিমাণে এত কম বেশী হয় কেন ? চৌকাণ্ডু বা জারজ ছেলে যদি জন্মায় বিধবার গর্ভে আর সে বিধবা যদি স্বামীর চুল্লা আর কুল্হারা তখনও ব্যবহার করে তাহলে সেই ছেলেকে সম্পত্তির একটা ভাগ দেওয়া হয় কেন ? গির্ড পাখির স্বভাবের সঙ্গে কাঠখুঁরের স্বভাবের তফাৎটা লক্ষ্য করেছেন কি ?

এতগুলো প্রশ্নের ভেতর একটিরও জবাব বেরুল না মাস্টারজীর মুখ দিয়ে।

এবার অম্রু বলল, আমার শেষ প্রশ্ন করবার আগে একটা কথা বলে নিচ্ছি। আমার বউ ছিল জন্ম খোঁড়া। সে কিন্তু আমার সঙ্গে মরবার আগে অব্দি পাহাড় ডিঙিয়ে বেড়িয়েছে। একদিন আমাদের পাশ দিয়ে একটা যাত্রীবোঝাই গাড়ী যাচ্ছিল। ড্রাইভার আমার বুড়ী বউটিকে খুঁড়িয়ে চলতে দেখে গাড়ী থামিয়ে বলল, চল, খানিক রাস্তা এগিয়ে দিই।

বুড়ী বলল, তারপর ?

তারপর আবার কি ?

ফের গাড়ী পাব কোথায় ?

ড্রাইভার কড়া মেজাজে বলল, কানা খোঁড়ার ভালো করতে নেই।

বাসের লোকেরা বলল, খোঁড়া মানুষের গুমর দেখ। খুঁড়িয়ে চলবে তবু গাড়ীতে উঠবে না।

বাসটা ফুঃ ফুঃ করে ধোঁয়া ছেড়ে রাগে গোঁ গোঁ করতে করতে ওপরে উঠে গেল।

এবার অম্রু কথা থামিয়ে মাস্টারজীর মুখের দিকে চেয়ে তার শেষ প্রশ্ন তুলল, এ দুনিয়ায় খোঁড়া আর চক্ষুষ্মান কে ? যে জন্মেছে খোঁড়া

হয়ে অথচ পথের কষ্টকে কষ্ট বলে মানে না, সে খোঁড়া না দুটো পা থাকতেও যারা এক পা গাড়ী ছাড়া চলতে পারে না তারা খোঁড়া ? আর চোখওয়ালা কে ? যারা গাড়ী চড়ে দেশ বিদেশ দেখে বেড়ায় তারা না যারা পায়ে হেঁটে কষ্ট করে নালা, কাণ্ডা, বন, পর্বতে ঘুরে বেড়ায় তারা ?

এ প্রশ্নের উত্তর অভিজ্ঞতা থেকে না হলেও কেতাব পড়ুয়ার চালাকি বুদ্ধি থেকে দিতে পারত, কিন্তু লজ্জা পেয়ে মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। তাই মাস্টারজী সেদিন চুপচাপ বসেছিল।

মহান্ত্‌ বলে, আমি না হয় একেবারে পঙ্গু বলে তুমি আমাকে তোমার সঙ্গী করনি পিতাজী কিন্তু তোমার নাতি তো আমার মত খোঁড়া নয়, তাকে কেন নিয়ে যাচ্ছ না ?

কুড়ির দিকে তাকিয়ে অম্‌রু বলে, তোমারও কি মনের ইচ্ছা তাই ?

কুড়ি বলে, আপনি সুখিয়াকে ইস্কুলে পাঠাতে চান নি, আমরা তাই করেছি পিতাজী। আপনি যদি ওকে সঙ্গে নিয়ে যান তাহলে আমরা খুশীই হব। ও আপনার কাছে থেকে পথ চিনবে, কাজ শিখবে।

অম্‌রু ছেলে বউ-এর কথায় বড় তৃপ্তি পেল। সে বলল, তোমাদের মনের কথাটা জানলাম। এখন আর আমার ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে কোন বাধা নেই।

একটু থেমে মহান্তর দিকে তাকিয়ে বলল, এই যে তোমার মেজভাই হিরন্থর বেটা গব্‌রু, তাকেও তো এক সময় সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কি অপমানটা করল তার বাপ। বলল, ফরেস্টের গার্ড হয়েছি। সাহেব বলে সেলাম করে সবাই। আমার ছেলে হবে পহাল ! তোমার মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে পিতাজী ? ও এখন ইস্কুলে পড়ছে, ওকে মিলিটারীতে ঢোকাব।—সেই থেকে আমি কারু ব্যাপারে নাক গলাই না।

আরও শোন তোমার মেজভাই-এর কীর্তির কথা। গতবার ভেড়

বক্রি নিয়ে কাংড়ায় জংলাৎ ম্যাকমা পার হচ্ছিলাম। আমি পিছু পড়ে গেছি। বাওয়ালরা এগিয়েছে দল নিয়ে। আমার কাছে হঠাৎ একটা বাওয়াল দৌড়ে এসে তির্নি চাইল। আমি হিসেব করে তির্নি দিলাম। ও আমাকে বেশ কয়েকটা আধ্লি ফিরিয়ে দিলে। বললাম, কি হল, তির্নির টাকা ফিরিয়ে দিলি যে ? ও বলল, ফরেস্টের সাহেবের সঙ্গে রফা হয়ে গেছে। সামান্য কিছু তির্নি ধরে নিয়ে বাকী আধাআধি বখরা। তাই এতগুলো পয়সা আর দিতে হবে না।

চটে গিয়ে বললাম, চল্তো দেখি সে কেমন সাহেব ?

বাওয়ালটা ভয় পেয়ে পালাল। আমি অফিস ঘরের সামনে গিয়ে দেখি হির্তু বসে তির্নি গুনছে।

এক ধমক দিয়ে বললাম, হারামজাদা বেইমান, বাপের কাছ থেকে ঘুষ খাচ্ছিস ?

উঠে দাঁড়িয়ে আমার বাওয়ালগুলোর ওপর চোটপাট চালিয়ে বলে কি, পিতাজীর ভেড় বলবি তো বেহেচরা।

আবার এক ধমক লাগিয়ে বললাম, ফের যদি হারামজাদা আমাকে পিতাজী বলে ডেকেছিস তো মুখ ভেঙে দেব। অম্রু পহাল বেইমানি করে নি জীবনভর, সে কোন বেইমান চোট্টার বাপও নয়।

মহান্ত্ বলল, বড়ভাই-এর জন্য বড় দুঃখ হয় পিতাজী। ভাবীজীকে ওর সেই ব্যবসাদার দোস্ত ভাগিয়ে নিয়ে যাবার পর থেকে ও যেন কেমন হয়ে গেছে।

অম্রু বলল, তিন তিনখানা ফলের বাগান করেছে। উলাংসায় একখানা আর ভারমৌরে দুখানা। এদিকে কোঠিও বানিয়েছে দুখানা। বউকে খুইয়ে বহুৎ রূপেয়া কামাচ্ছে।

মহান্ত্ বলল, গেল বছর এদিকে ব্যবসার ব্যাপারে এসেছিল, দেখা করে গেছে। কথা হল অনেক। বাগান বাগিচার কথাও বলল। ভাবীজীর কথা হল সে নাকি এখন পাঠানকোটে ঐ লোকটার ঘর করছে। দোস্তি পাতিয়ে শুধু বউ নয়, অনেক টাকাও হাতিয়ে নিয়ে গেছে লোকটা।

অম্রু বলল, মহান্ত্, একটা কথা মনে রাখবি, যে মরদ নিজের বউকে কাছে রাখতে পারে না সে টাকা পয়সা ক্ষেতখামারও রাখতে পারবে না। আমি আর তোর মা পথ চলতে কত দিন দেখেছি, আপেল বোঝাই লরীতে হস্তিরামের বউ জুগনীকে পাশে বসিয়ে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার দোস্তটা। তোর মা বলত, মুখ্যু হস্তিরামটার কপাল ভাঙল বলে।

একটু থেমে আবার বলল অম্রু, জরু আর জমিন হাতছাড়া করতে নেই। একবার হাতের থেকে বেরিয়ে গেছে কি ও আর ফিরে আসবে না।

মহান্ত্, বলল, ভাবীজী ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর বড়ভাই পাগলের মত টাকা রোজগার করে যাচ্ছে। আমার মনে হয় টাকার নেশায় মেতে ও দুঃখ ভোলার চেষ্টা করছে।

হাসল অম্রু। বলল, সুখ তো ধনে নাই বাপ, মনে। ওর মন পুড়ছে। ধন দিয়ে কি মনের আগুন ঢাকা যায় রে।

ছোট ছেলে মহান্তের কোঠি থেকে চলে আসার আগের দিন বুড়ো অম্রু চারদিক ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল। লম্বা ক্ষেতি। এক প্রান্তে তাপ্রি (খড়ে ছাওয়া কুঁড়ে ঘর)। রবি ফসল উঠে গেছে। এখন ক্ষেতে কোন চাষ পড়েনি। অম্রু গাছপালার ভেতর দিয়ে এসে দাঁড়াল তাপ্রির কাছে। মহান্ত্, রুবানা বাজাচ্ছে। তার পাশেই সোয়ারু বা সবজির ক্ষেত থেকে ভ্যানঠু বা বেগুন তুলে তাপ্রির তলায় জড়ো করে রাখছে কুড়ি। অনেক আগেই দতিয়ালু বা মধ্যাহ্ন ভোজের পাট চুকে গেছে। এ সময় ক্ষেতে কোন ফসল নেই, তাই তাপ্রিতে বসে পাহারা দেবার দরকারও নেই। তবু এই নির্জন নিস্তব্ধ দুপুরগুলোতে কুড়ি তার স্বামীকে ধরে এনে তাপ্রিতে বসিয়ে দেয়। কখনো সে তরকারী তোলে সবজির ক্ষেত থেকে, আবার কখনো একখানা থালি পেতে তার ওপর মেশান মটর আর ছোলার দানা ফেলে পৃথক করে নেয়। গোল মটরগুলো থালার একদিকে গড়িয়ে চলে যায় আর কোণওলা ছোলাগুলো এক জায়গায় পড়ে থাকে।

অমৃরু গাছের আড়াল থেকে দেখল, কাজ শেষ করে তার খোঁড়া ছেলের পাশটিতে গিয়ে বসল কুড়ি। রুবানায় দুপুরের একটা রাগিণী বাজছে আর কুড়ি বাজনা শুনতে শুনতে মহান্তের খোঁড়া পা-খানার ওপর অসীম মমতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

অমৃরুর চোখ সে দৃশ্য দেখছিল আর বার বার ঝাপসা হয়ে উঠছিল। অমৃরু মনে মনে প্রার্থনা জানিয়ে বলতে লাগল, বাবা মহাদেও, তোমার আশীর্বাদ থেকে এরা যেন কোনদিন বঞ্চিত না হয় প্রভু।

যেমন নিঃসাড়ে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে কোঠির দিকে ফিরে গেল অমৃরু। কোঠির পেছনে ওরি অর্থাৎ ভেড় বক্‌রির আস্তানা। অমৃরু পায়ে পায়ে সেদিকে চলল। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। ভুরুর ওপর হাতের পাতা ছুঁইয়ে দেখতে লাগল। একটা বক্‌রির বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ টেনে খাচ্ছে দাব্‌বু।

এক পলকে উঠে দাঁড়াল সে। একটা গাছের তলায় আহারে তৃপ্ত কয়েকটা ভেড় আধবোজা চোখে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করছিল। দাব্‌বু চুপি চুপি গিয়ে একটার পেটের ওপর কান পেতে গুড়গুড়ি শুনতে লাগল। ভেড়টি অলস গলায় সামান্য আপত্তি জানিয়ে যেন বলতে লাগল, কি হচ্ছে, ও কি হচ্ছে? একটুখানি ঝিমুতেও দেবে না নাকি?

অমৃরু মনে মনে ভারি খুশী হয়ে উঠল। হাঁ, এবার সত্যিই দাব্‌বুকে সঙ্গে নেবার সময় হয়েছে।

পরের দিন গদ্দীর সেই বিশেষ পোশাকগুলি পরে বুড়ো অমৃরুর সঙ্গে উড়ান্ধারের পথে এই প্রথম যাত্রা করল দাব্‌বু। হাঁটু অব্দি ঝোলা চোল। কোমরে ইয়া লম্বা ডোর পেঁচিয়ে জড়ান। পায়ে নাগরা জুটা আর মাথায় কৈলাস পর্বতের চূড়ার আকারে টোপি। হাতে কুলহারা নিয়ে সবার আগে এগিয়ে চলেছে সে মহা উৎসাহে। কোমরের ডোরে ঝোলান বাঁশুরীখানা চলার ছন্দে দোল খাচ্ছে।

দাদাজীর কাছ থেকে ইতিমধ্যেই সে শিখে নিয়েছে ভেড়বক্‌রি

চালনা করবার জন্য কয়েক রকমের সিদ্ধ্ বা শিস্। সেই সিদ্ধ্ শুনে গদ্দী কুত্তর ডাইনে বাঁয়ে চালিয়ে নিয়ে যাবে পুরো দলটাকে।

দাব্‌বু তার নতুন শেখা সিদ্ধের এলোপাথাড়ি পরীক্ষা চালাতে লাগল। ভুল হতে লাগল মাঝে মাঝে। ডাইনে ঘুরতে বাঁয়ে ঘুরে গেল দল। আবার বাওয়ালরা ফেরাল তাদের।

অম্‌রু নাতির কাণ্ড দেখছে। সেও এমনি ভুল করত প্রথম প্রথম। ভুল না করলে ঠিক হবে কি করে। যত ভুল, তত শেখা. নতুনের সঙ্গে তত পরিচয়। অম্‌রুর মনে উজানের স্রোত বইছে আজ। সে গদ্দী পহালের ঘরে জন্মেছে। তার পূর্ব পিতামহরা ভেড়বক্‌রি নিয়ে সারা জীবন ঘুরে বেড়িয়েছে পাহাড়ে পর্বতে, পথে প্রান্তরে। সেও ঐ একই পথে ঘুরেছে শিশুকাল থেকে। কিন্তু হঠাৎ একটা পাথর যেন গড়িয়ে এসে আটকে দিল ঐ জীবনের ধারা। বন্ধ হয়ে গেল আনন্দের স্রোত। বংশধরেরা ছুটেছে নতুন জীবনের খোঁজে। ভেসে যাচ্ছে চোরা স্রোতের টানে। সে শুধু দেখছে। ঐ স্রোত থেকে টেনে ফেরানোর শক্তি তার নেই। অম্‌রু কাউকে টেনে তুলতেও চায় না।

হঠাৎ অম্‌রুর আনন্দের উৎস মুখে চাপাপড়া সেই পাথরটাকে ছুটো কচি হাত আর পায়ের শক্তি দিয়ে সরিয়ে দিল দাব্‌বু। অমনি উচ্ছ্বাসে বুক ছাপিয়ে উথলে উঠল আনন্দের ঢেউ। অম্‌রুর সারা মন সেই খুশীর স্রোতে স্নান করতে লাগল। গদ্দী পহালের বংশে আর একটা পহাল জন্ম নিল।

খর নালা একটা পার হয়ে যেতে হবে। গভীরতা নেই কিন্তু বেগ আছে স্রোতের। একটা ধাড়ো ভেড়কে নামিয়ে দেওয়া হল জলে। বরফ গলা জল পায়ের চামড়া ভেদ করে হাড়ে ঢুকছে। তবু বাঁকা শিং উঁচিয়ে মুখখানা ঈষৎ কাত করে দাঁড়িয়ে আছে সে। দলের সর্দারকে বিপদের ঝুঁকি আগে নিতে হয়, নইলে সে এত বড় দল চালনা করবে কি করে।

সর্দারের দেখাদেখি আরও কয়েকটি নেমে এসে সর্দারের পাশে ভিড় করল। তাদের অনুসরণ করল আরেক দল। ভয়ে এদিকওদিক

পালাবার ফিকির খুঁজছিল কয়েকটা। বাওয়ালরা তাদের ফিরিয়ে আনল কানে ধরে। ঠেলে দিল স্রোতের ভেতর। চেঁচিয়ে কাঁদছিল একটা উর্ণী, দাব্‌বু তাকে বুকে তুলে চেপে রাখল। ভয় কি, চুপচুপ।

সমস্ত দলটা এবার সর্দারের পিছু পিছু চলতে শুরু করেছে। মুক্তোর দানার মত জল ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ভিজে সপসপে হয়ে গেছে দেহের লোম। ওপারে উঠে ঝটাঝট্‌ গায়ের জল ঝাড়া শুরু হল। তারপর আবার চলা।

নীর (চারণক্ষেত্র) অথবা ধৌলুতে (চারণক্ষেত্র) এসে পৌঁছলেই ঘাসের জমিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পুরো দলটা। প্রাণভরে খেয়ে নাও, সামনে আছে কঠিন দুর্গম পথ।

রাতে খানাপিনা শেষ করে খোলা আকাশের নীচে শুয়ে পড়ে ওরা। সারাদিন চড়াই উৎরাই ভাঙার পরিশ্রমে ক্লান্ত বাওয়ালদের চোখে ঘুম নামে। পর্বতের বরফ ছুঁয়ে ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া বয়ে আসে। একখানা পাট্টু নাচে পেতে আর একখানা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ে সবাই। দাদাজীর গা ঘেঁষে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে দাব্‌বু। আকাশে তারারা দেওয়ালীর দীপ জ্বালিয়ে রেখেছে। অম্‌রুর চোখে ঘুম নেই। নাতির মুখখানা সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। দাব্‌বুর বুকে হাতখানা ছুঁইয়ে রেখে সে অনুভব করছে একই রক্তের উত্তাপ।

কখন তন্দ্রা এসে গিয়েছিল অম্‌রুর। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। সামনের পাহাড় থেকে কে যেন উঁকি দিয়ে দেখছে। উঠে বসে চোখ মুছে আবার তাকাল অম্‌রু। চাঁদ। মাঝ রাতে পাহাড়ের আড়াল থেকে মাজা পেতলের থালার মত ভাঙা চাঁদটা উঁকি দিচ্ছে। যেন ঘোমটা দেওয়া বউ আধ ফালি মুখ বার করে অম্‌রুকে জিজ্ঞেস করছে, ছেলেটা কে গা ?

অম্‌রুর সেই মুহূর্তে আনন্দে পাহাড় ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছে করল, দাব্‌বু, দাব্‌বু পহাল, আমার নাতি গো নাতি।

কাংড়া থেকে সরল উপত্যকা ওরা পেরিয়ে এল দু সপ্তাহে। এই প্রথম সরলে এসে দাব্‌বু দেখল তার দাদাজীর বাপের তৈরি কোঠি।

দু'টো দিন ওখানে কাটিয়ে ওরা উঠতে লাগল ওপরে। পথে পড়ল কিয়ানি, পুখরী, কোটি গ্রাঁ। দাব্‌বু দেখল গ্রাঁয়ের মানুষজন প্রায় সবাই তার দাদাজীর চেনা। দাব্‌বুকে তারা সবাই আদর করল। কেউ কেউ মক্‌কি আর মেঠাই খেতে দিল।

পর পর পাহাড়ের গায়ে গায়ে সুরঙ্গাঁনি, কালহেন, নাকরোর পেরিয়ে ওরা ঢুকল তিসায়। এক বাউড়ির ধারে ওরা শেষ বেলায় ডেরা ফেলেছিল। ক'টি মেয়ে জল নিয়ে চলে গেল। একটি বউ দাব্‌বুকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল। দাব্‌বু কাছে গেলে তাকে সামনে একটা কোঠি দেখিয়ে বলল, একবার এসো তো আমার সঙ্গে। দাব্‌বু ভারী খুশী। বউটির সঙ্গে সে তার কোঠিতে গেল। অমরু বাধা দিল না। ফিরে যখন এল, হাতে একরাশ খাবার। মেয়েটির বাচ্চা হয়েছে। পনের দিনে উৎসব। বব্‌রু (পুরী) বানিয়ে লোকজন খাওয়ানো চলছে। ঘরের কাছে মানুষগুলো ডেরা ফেলেছে, তাই তাদেরও আনন্দের কিছু অংশ দেওয়া। দাব্‌বুর আনা বব্‌রু খেয়ে সবাই শিশুটির মঙ্গল কামনা করল।

এরপর এল গোয়ারি গ্রাঁ। একটু দূরে খরস্রোতা নালার ওপর পুরাতন কাঠের পুল মেরামত হচ্ছে। পুলের ধারে ঠিকাদারের কাঠের তক্তা সাজিয়ে তৈরী হয়েছে সাময়িক চায়ের দোকান। ঠিকাদারের লোকেরা বসে তারিয়ে তারিয়ে চা খাচ্ছে। কাজ শেষ হলেই ভেঙে যাবে দোকান।

যা পথে পড়ছে অবাক হয়ে তাই দেখছে দাব্‌বু। তারেলা গ্রাঁ ছাড়াতেই শুরু হল বনের পথ। কি একটা পাখি গাছের কাণ্ডে ঠোকর মারছে। নির্জন বনে ঠক ঠক আওয়াজটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে।

কে আওয়াজ করছে দাদাজী?

কাঠখুর পাখি।

কি রকম দেখতে?

ছোট পাখি, ধূসর রঙ।

দাব্‌বু নাচু হয়ে ঘাড় কাত করে পাখির খোঁজ করতে লাগল,

কিন্তু বনের গভীর ডালপালার ভেতর তাকে আবিষ্কার করতে পারল না। অমৃরুর দিকে ফিরে বলল, দাদাজী তুমি কি করে জানলে পাখিটা ছোট। তার নাম কাঠখুর?

আমি দেখেছি ভাই। শুনেছি তার নাম।

আমি কেন দেখতে পাচ্ছি না?

এমনি দিন রাত পথ চলতে চলতে তুমিও কত গাছ, ফুল, লতাপাতা পাখি চিনতে পারবে। কত নাম শুনবে।

বাণ আর খাসরুর বন পেরিয়ে যেতে যেতে অমৃরু হঠাৎ কয়েকটা বক্‌রিকে হেই হেই করে তাড়া করল।

ওদের অমন করে তাড়াচ্ছ কেন দাদাজী?

ওরা দলছাড়া হয়ে সরকারের লাগান চারাগাছ মুড়িয়ে খাচ্ছে।

খেলে কি হয়?

গাছ মরে যায়। বড় হতে পারে না।

গাছ মরে গেলে কি হয়?

কোঠি তৈরীর কাঠ মিলবে না। রান্নার জন্যে ডালপাতা মিলবে না।

এবার বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ল দাব্‌বু।

অনেক ওপরে উঠে এল ওরা। দশ বারো হাজার ফুট ওপরে ভূর্জপাতার বন। লম্বা লম্বা গাছ। গায়ে বাদামী রঙের দাগ। উড়ুক্কু কাঠ-বেড়ালী একটাকে ছুটতে দেখে তার পিছু নিল দাব্‌বু। তির্‌তির্‌ করে লেজফোলা কাঠবেড়ালীটা উঠে গেল গাছে। দাব্‌বু গাছটা জড়িয়ে ধরে হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে।

বন শেষ। গাছপালার চিহ্ন নেই। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে নানা রঙের ছোট ছোট ফুল। শতরুণ্ডীতে এসে এপারের শেষ ডেরা পাতল অমৃরুর বিপুল বাহিনী। অদূরে বেলা শেষের আলোয় রহস্যময় হয়ে উঠেছে সাচ গিরিপথ।

দাব্‌বু আঙুল তুলে বলল, দাদাজী ঐ জোৎ আমাদের পেরিয়ে যেতে হবে?

হাঁ ভাই। ঐ জোৎ পেরুলেই আমরা নামব পাঙ্গী উপত্যকায়। ওখানে তুষার পর্বতের মাঝখানে আছে সবুজ নিরু ঘাসের কাণ্ডা।

তুমি কি করে ঐ কাণ্ডার খবর পেলে দাদাজী ?

আমার পিতাজীর কাছে।

তোমার পিতাজী কার কাছ থেকে পেল ?

তার পিতাজীর কাছে।

তার পিতাজী কোথা থেকে পেল ?

গদ্দীর কাছে।

গদ্দী কোথায় পেল ?

মহাকালের কাছে।

মহাকাল কে ?

যিনি কখনো থামতে জানেন না, গদ্দীদের সিদ্ধ্ দিতে দিতে চালিয়ে নিয়ে যান।

আমাকে সেই আদমীকে চিনিয়ে দেবে দাদাজী ? আমি তার কাছ থেকে অনেক অনেক রকম সিদ্ধ্ শিখে নেব।

তাঁকে কেউ চিনিয়ে দিতে পারে না, নিজেকে চিনে নিতে হয় ভাই।

আমি চিনতে পারব ?

আলবৎ পারবে। যে গদ্দী-পহালদের মত কেবলই চলে, সে তাঁকে একদিন দেখতে পায়। চিনতে পারে।

বড় উৎসাহে নবীন এক প্রাণের টানে কাংড়া থেকে শতরুণ্ডীর ল্যাসে প্রায় উড়ে চলে এসেছে অমৃরু। দেহের কষ্টকে মনের আনন্দ দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে। কিন্তু এবার বুঝি দেহ বিদ্রোহ করে। অমৃরুর মনে হয় কেমন যেন শিথিল হয়ে আসছে তার দেহ। রাত্রিতে বিশ্রাম চাই, পুরো বিশ্রাম। কিন্তু বিশ্রাম চাইলেই কি পাওয়া যায়। অবিশ্রাম চলার শোধ তুলতে চায় দেহ। সবাই ঘুমোয়। কেবল ঘুম আসে না অমৃরুর চোখে। কখনো তন্দ্রা, কখনো জাগরণ। তন্দ্রার ভেতরে পিতাজী হরিচন্দ্ পাশে এসে বসে। হাত বুলিয়ে দেয় গায়ে মাথায়।

অম্রু যেন দাব্বুর মত দশ বছরের বালকটি। তার মনে হয়, সে বুড়ো অম্রুর পোশাকখানা খুলে ফেলে বালক অম্রুর পোশাকটা পরেছে। ছেনছেল্লা বুড়ি বলছে, অম্রু, কখন এলি দাদা? একটা খরস্রোতা নালা বয়ে চলেছে। ওপরে বরফের আস্তরণ। অম্রু বরফ সরিয়ে কান পাতছে। একটা ক্ষীণ শব্দ বহু দূরের থেকে ভেসে আসছে—অম্রু, আয় বেটা, আমার কোলে আয়।

জুস্‌মুদার আলো ফুটছে। সবাই তৈরী। কঠিন চড়াই সামনে।

কারু মুখে কথা নেই। নিঃশব্দে পুরো দলটা এগিয়ে চলেছে জোতের দিকে। দাব্বু তার দাদাজীর কাছ থেকে জেনেছে জোতের দিকে এগিয়ে চলার সময় পেছন ফিরে তাকাতে নেই। শুধু সামনে চোখ রেখে চলা।

অম্রু সবার পেছনে। টলছে আর চলছে। সামনের প্রবাহ তাকে টেনে নিয়ে এসেছে জোতের মুখ অব্দি।

এই তো সেই গিরিপথ, যাকে বার বার অতিক্রম করে গেছে সে। আজ মনে হচ্ছে গিরিপথের দু'দিকের দুটি শৃঙ্গ মহাদেবের ত্রিশূলের মত নীল আকাশকে স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাঝ দিয়ে প্রসারিত পথ। অম্রু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, দাব্বু বাওয়ালদের সঙ্গে উঠে গেছে গিরিপথে। তরঙ্গিত ভেড়ার পাল ঠিক যেন তুষার-নদীর স্রোত। বিপরীত মুখে উৎসের দিকে উঠে চলেছে।

অম্রুর চোখের উপর ফুটে উঠল আর একটা দৃশ্য। অগণিত ভেড়ার পাল চলেছে। সঙ্গে সারি সারি গদ্দী-পহাল। এ অশেষ। নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা। সিন্ধ্ উঠেছে। আকাশে বাতাসে, পর্বতে প্রান্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সে সিন্ধ্। 'হ্যালা হুই, হ্যালা হুই'—চল চল এগিয়ে চল।

পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে আছে অম্রুর দেহ। ডান হাতখানা গিরিপথের দিকে প্রসারিত।

●